# সাহিত্য সাধনায়
# মহামান্য দশম সংঘরাজ

অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের

# লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এ গ্রন্থের লেখক কুমিল্লা বৌদ্ধ ভিক্ষু সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের একজন সাহিত্যিক, লেখক গবেষক ও ধর্মীয় গুরু হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।

তিনি চল্লিশ দশকে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলা বৌদ্ধজন অধ্যুষিত পল্লী কোঁয়ার গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তের বছর বয়সে ৭ম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে সংসার ধর্ম ত্যাগ করেন। তিনি বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাথেরোর কনিষ্ঠ শিষ্য হিসেবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভের পর পালি ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়ণ করেন। সূত্র বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

লেখক ষাট দশক হতে ধর্মীয়, সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে প্রায় দেড় শতাধিক উর্দ্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে সে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের অধীনে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা ও পালি সিলেবাস বই রচনা করেন। ইতিহাস ও বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে তাঁর ২০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ১৯৭২ সাল হতে প্রায় তিন দশক পর্যন্ত লালমাই কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন। ফেনী ও মাইজদি পি.টি.আই কলেজে ১৯৮৭ সাল হতে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে সম্মানী শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে তিনি লাকসাম উপজেলার বাগমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৭২ সাল থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি ১৯৬৫ সালে কুমিল্লা শহরের কনকস্তূপ বৌদ্ধ বিহারে প্রতিষ্ঠিত পালি ও সংস্কৃতি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে এখনও দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা শহরের ঠাকুরপাড়ায় কনকস্তূপ বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন।

অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের ইতিহাস পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি বিভিন্ন সেমিনারে ইতিহাস বিষয়ে গবেষনা মূলক মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কুমিল্লা শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক থিয়োসফিকেল সোসাইটির সভাপতি রূপে ১৬ বছর ব্যাপী দক্ষতার সাথে এ সোসাইটির কার্যক্রম চালিয়েছেন। এ সোসাইটির আন্তর্জাতিক সেমিনারে ১৯৮৭ সালে ভারতের চেন্নাই গিয়েছিলেন।

তিনি থাইল্যান্ড, মায়ানমার, শ্রীলংকা ও ভারত ভ্রমণ করেন। একজন সংসার ত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়েও বিভিন্ন ধর্ম সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও সকলের নিকট সুপরিচিত।

# কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূলবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

# সাহিত্য সাধনায় মহামান্য দশম সংঘরাজ

সম্পাদনায়

অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের

**"Sahitya Sadhanaya Mahamanya Dasam Sangharaj" – Written by Dharma Rakshit Mahattera, Principal Sambodhi Pali and Sanskrit College, Comilla- 2004 B.C.**

---

**প্রকাশিকা ঃ** শ্রীমতি কানন বালা সিংহ

•

**স্বত্ত্ব ঃ** লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ।

**প্রাপ্তিস্থান ঃ** কনকস্তূপ বৌদ্ধ বিহার, কুমিল্লা ।

**বর্ণ বিন্যাস ও প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ অন্য ভুবন,**
চৌধুরী মার্কেট,
বাদুরতলা, কুমিল্লা ।

**মুদ্রণে ঃ** **ছাপা বিতান,**
লাকসাম রোড,
রামঘাট, কুমিল্লা ।
তারিখঃ ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪
বিজয় দিবস

**শ্রদ্ধাদান – ৩০.০০ টাকা**

# লেখকের প্রতিবেদন

দ্বি- সহস্রাব্দে উপমহাদেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় থেরবাদ বৌদ্ধ সংঘে মহামান্য ১০ম সংঘরাজ নিজ মেধা ও সাধনার দ্বারা সাসনের ইতিহাসে যে স্থান করে নিয়েছেন, এ দুর্লভ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় বৌদ্ধ জনগণ গৌরব বোধ করে। তিনি বুদ্ধ সাসনে বিনয়াকুল জীবন যাপন করেও, আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে লোক সমাজে এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তদোপরি আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে সাথে সাহিত্য সাধনা করেও তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, এর জন্য তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে চিরদিন, কালকে অতিক্রম করে বর্তমানে। আমি তাঁর অমর সৃষ্টি সাহিত্য কর্ম যাতে কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে না যায়, সেজন্য এ গ্রন্থ রচনা করার জন্য চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থ রচনা করার পেছনে আমাকে অনেক মানসিক শ্রম দিতে হয়েছে। গ্রন্থ রচনা করা যত সহজ, কিন্তু প্রকাশ করা তত সহজ নয়। অনেক চেষ্টার পর গ্রন্থ প্রকাশ করা হলেও , গ্রন্থ ক্রয় করে পড়ুয়ার সংখ্যা অতি নগণ্য। তবুও নিজকে একটি সৎকর্মে নিয়োজিত রেখে, যাঁর সম্পর্কে লেখক তাঁর ভাবের সাথে সম্পৃক্তার যোগসূত্র রচনা করার জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহামান্য দশম সংঘরাজের সাথে আমি তাঁর সহযোগি হিসেবে বিগত-৪০ বছর ব্যাপি কাজ করেছি। তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়ে, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করেছি। মৃত্যুর পরও আপনবোধে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ভার আমার উপর বর্তিয়েছে। কিন্তু, বিভিন্ন উদ্ভুত পরিস্থিতির মাধ্যমে বুঝতে পারলাম, স্বকীয়তা এবং আত্মসম্মান রক্ষা করে কাজ করা সম্ভব নয়। এর মধ্যেও তাঁর অমর সৃষ্টি সাহিত্য কর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হই। এর দ্বারা আমিই উপকৃত হচ্ছি। হয়ত শত বছর পরও যদি কোন মানুষ এ গ্রন্থখানা পড়বেন তখনই মহামান্য ১০ম সংঘরাজের অমর সৃষ্টির কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। আমি তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে শ্রদ্ধা করে এসেছি, তাঁর মৃত্যুর পরও সে শ্রদ্ধা অটুট রয়েছে। আমার জানা মতে আমি কোনদিন, তাঁর সাথে উচ্চবাক্য উচ্চারণ করিনি।

চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলিনি মনে হয় এজন্যই তাঁর প্রতি মহিমাময় আশীর্বাদই আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে রয়েছে।

মহামান্য দশম সংঘরাজের মৃত্যুরপর কুমিল্লা-নোয়াখালী বৌদ্ধ সমাজের অবস্থা কি স্তরে গিয়ে পৌছুবে আমি বহুবার বহুজনের নিকট বলেছি। তবুও বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এ গ্রন্থ লেখা ও প্রকাশ করার দুঃসাহস নিয়ে চেষ্টা চালিয়েছিলাম। কয়েকজন দায়ক দায়িকাকে এ গ্রন্থখানা প্রকাশ করে প্রাচীন সমতটের (কুমিল্লা জেলা) গৌরব রবি পন্ডিত শীলভদ্রের উত্তরসুরী দ্বি-সহস্রাব্দের খ্যাতনামা পন্ডিত, পূজনীয় ১০ম সংঘরাজ জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর সাহিত্য কর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আহ্বান করি। অনেকে আশা দিয়েও আশা পূরণ করেননি। তবুও তাদের প্রতি আমার মৈত্রীপূর্ণ শুভাশিস্ রল। কারণ তাদের উৎসাহ না পেলে হয়ত এ গ্রন্থ রচনা মোটেও সম্ভব হতনা।

শেষ পর্যন্ত আমার অতৃপ্ত আশা পূর্ণ করলেন পুণ্যাবতী উপাসিকা শ্রীমতি কানন বালা সিংহ। তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাধীন ৪নং বাকই ইউনিয়নের অন্তর্গত কোঁয়ায় গ্রামের সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বিবাহ হয়েছে তাঁর নিজ গ্রামের আরেক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারের স্বনামধন্য শ্রী লাল মোহন সিংহ মহোদয়ের সাথে।

কোঁয়ায় গ্রাম নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অতি সুপ্রাচীন। এ গ্রামে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে সুখে-স্বাছন্দে বাস করে আসছে। এ গ্রামের দুহাত মাটি খনন করলেই প্রাচীন মানুষের ব্যবহার্য মৃৎ-পাত্রের টুকরা পাওয়া যেত। আমি ছোট বেলায় আমার বাড়ীর সামনে যে ছোট পুকুর রয়েছে, সে পুকুরের পাড় থেকে অটুট হাঁড়ি-পাতিল সংগ্রহ করেছিলাম। এছাড়াও গ্রামের বিভিন্ন উচুঁ ভিটিতে মৃৎ-পাত্রের টুকরা পাওয়া যেত। নিশ্চয়ই এ গ্রামে মানুষের বসতি ছিল বলেই এসব মানুষের ব্যবহার মৃৎ-পাত্রের টুকরা পাওয়া যেত। এ গ্রামের উত্তর পশ্চিম অংশে কালিপুকুর নামে একটি মজা পুকুর বর্তমানেও রয়েছে। সে পুকুর পাড়ে পুরানো বটবৃক্ষ ছিল। একটি ছোট মন্ডপে কষ্টিক পাথরের ভগ্ন কালিমূর্তি পূজিত হত। পরবর্তী সময়ে বর্তমান উত্তর পাড়ায় সকলের সুপরিচিত ভূঞা বাড়ীর পুকুর ঘাটায় পুরাতন বিশাল

বটবৃক্ষের নিচে পাকা বেদীতেও ভগ্ন কালো পাথরের কালি মূর্তি পূজিত হত। বাৎসরিক উৎসবাদি হত। এ বাড়ীর সামনে সুসজ্জিত মন্ডপ ও নাটঘর ছিল। এ মন্ডপে সার্বজনীন দূর্গা পূজা হত। নাট মন্দিরে বিভিন্ন সময়ে কীর্তন হত। বর্তমানেও স্থানীয় কবিরাজ **নবীন সিংহের** বাড়ীর সামনে সুউচ্চ পুকুরপাড়ে একটি পুরানো বট বৃক্ষ কালের সাক্ষী রূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ বট বৃক্ষের দক্ষিণ দিকে খোলা মাঠ। গরমের সময় পথশ্রান্ত পথিকেরা আজও এ গাছের ছায়ায় বসে ক্লান্তি দূর করে। গাছের বিশাল আকারের শিকর, ডাল পালার রং দেখে অনুমান করা যায় ৫/৬ শত বছর আগেকার পুরানো এ বটবৃক্ষটি । এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় এ কোঁয়ার গ্রামটি অতি পুরাতন। এ গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় ভূঞা বাড়ীতেও দূর্গা পূজা হত। এ বাড়ীর সামনে পুকুরপাড়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অতি প্রাচীন বিদ্যালয় বলে সুনাম রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৪৮-১৯৫২ সালে লেখাপড়া করেছি। এ গ্রামেই বৌদ্ধ পাড়ার স্বর্গীয় **ভৈরব সিংহ** মহোদয়ের বাড়ীর সামনে একটি বুদ্ধের মন্ডপ ছিল। এ বিহার ১৯৬২ সনে আমার প্রেরনায় **ডাঃ গিরিশ চন্দ্র সিংহ, শ্রী রাজ কুমার সিংহ, শ্রী মহিম চন্দ্র সিংহ,** মহোদয়গণ পূজনীয় **পূর্ণানন্দ মহাথেরোর** নিকট প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে সে মন্ডপটি স্বর্গীয় **শীতল চন্দ্র সিংহ , অনিল চন্দ্র সিংহ, লাল মোহন সিংহের** দানকৃত ভূমিতে ইন্দ্রধাম বৌদ্ধ বিহার রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ গ্রামেই তিন সম্প্রদায়ের অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সমাজে তাঁদের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। এর দ্বারা বুঝা যায় এ কোঁয়ার গ্রামের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সকলের নিকট প্রশংসা লাভ করেছিল। ক্ষুদ্র পরিসরে প্রকাশিকার পরিবারের কিছু কথা তুলে ধরছি।

এ কোঁয়ায় গ্রামে বর্তমানে চার বংশের লোকের সংখ্যাই বেশী। এর মধ্যে আমার বংশের আদি পুরুষের নাম খেলারাম সিংহ। এর প্রকাশিকা বংশের আদি পুরুষের নাম ও বংশ পরিচিতি তুলে ধরলামঃ-

এ বংশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রথিতযশা, কবিরাজ **নবীন সিংহ** ছিলেন অন্যতম। সৌম্য, গৌররর্ণ দেহকান্তি, কবিরাজ **নবীন সিংহ** একজন জ্ঞানী ,সমাজ হিতৈষী, ও সমাজ দরদী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৫ বছর ব্যাপি ৪নং বাকই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং ১০ বছর ধরে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি একজন সৎব্যক্তি, যুক্তিবাদী এবং তার্কিক ছিলেন। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কল্পে তিনি অকাট্য যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৌদ্ধ সমাজে আজো তাঁর নাম যশের কথা মানুষ মুখে মুখে উচ্চারণ করে থাকেন। তিনি পশ্চিমগাঁও নবাব ফয়জুন্নেছা মহোদয়াকে চিকিৎসা করেছিলেন। নবাবেরা তাঁদেরকে **মজুমদার** উপাধি দিয়েছিলেন। স্বনামধন্য কবিরাজ **নবীন সিংহের** উত্তরাধিকারী রূপে যিনি লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র মেম্বার শ্রী **অনিল সিংহ**। তিনি ২৪ বছর সুনামের সাথে ৪নং বাকই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি **অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার, জনাব সুরুজ মিঞা** সহ আরো অনেক রাজনীতিবিদদের সাথে তাঁর দহরম- মহরম ছিল। মেম্বার অনিল সিংহ কুমিল্লা বৌদ্ধ সমাজ সহ জাতিধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বড় বড় সামাজিক সমস্যা সমাধান করেছেন। তিনি কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। নির্ভীক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সমাজে আজও লোকমুখে উচ্চারিত হচ্ছে।

এ মেম্বার **অনিল সিংহের** ছোট ভাই স্বর্গীয় **লালমোহন সিংহ** যৌবন বয়সে কলকাতায় প্রায় ১৫ বছর কংগ্রেস অফিসে চাকুরী করেছেন। সে সময় ভারতের অনেক জাঁদরাল কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় হয়। তিনিও সমাজের হিতকল্পে সুনামের সাথে কাজ করেছেন। পাঁচবার বুদ্ধগয়া সহ অন্যান্য বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করেছেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র **সমর সিংহ** (ডবল এম,এ) পাশ করে বর্তমানে U.N.D.P. অফিসে আমেরিকায় চাকুরীরত রয়েছেন। তিনি নিউইয়র্ক শহরস্থ বাংলাদেশ বুড্ডিষ্ট সেন্টার অব আমেরিকার নির্বাচিত সভাপতি। মধ্যম পুত্র **অমর সিংহ** ঢাকায় একটি এন,জি, ও তে চাকুরী করছেন। কনিষ্ঠ পুত্র **নির্মল সিংহ** ( এম,এ) ৪নং বাকই ইউনিয়ন পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য লাভ করে জনসেবায় নিজকে নিয়োজিত রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, **সমর সিংহ** ও তদীয় পত্নী **শ্রীমতি সুচিত্রা সিংহ**

(এম.এ) কোঁয়ার ইন্দ্রধর্ম বিহার উন্নয়নে অনেক ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা কুমারী **সুষমা সিংহ** আমেরিকায় শিক্ষারত রয়েছে।

এ বংশের স্বর্গীয় শীতল চন্দ্র সিংহের বড় ছেলে বিজয় সিংহ সমাজের সেবা কর্ম এবং তার ছোট ভাই ইন্দ্রজিতের স্ত্রী শ্রীমতি প্রীতিকনা সিংহ ৪নং বাকই ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য রূপে নির্বাচিত হয়ে এ বংশের গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। আমি এ গ্রন্থটি ছাপাবার জন্য **অমর সিংহকে** প্রস্তাব দেই। তখন সে রাজী হয়। এ ব্যাপারে **সমর সিংহ** আমেরিকা হতে ২৩,২৪ সেপ্টেম্বর মোবাইলে আমার সাথে কথা বলে। তাদের অর্থানুকুলে তাদের পূণ্যাশ্লোকা মাতা **শ্রীমতি কানন বালা সিংহ** প্রকাশিকা রূপে দায়িত্ব নেন। তাঁর স্বর্গীয় স্বামী **লালমোহন সিংহ** মহোদয়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। সেজন্য আমি প্রকাশিকা ও এ স্বনাম ধন্য পরিবারের সর্ববিধ মঙ্গল কামনা করি।

আশীর্বাদক
শ্রী ধর্মরক্ষিত মহাথের
অধ্যক্ষ
কনকস্তূপ বৌদ্ধ বিহার
কুমিল্লা।

তারিখঃ- ১লা ডিসেম্বর-২০০৪খ্রিঃ
২রা পৌষ-১৪১১ বাংঃ

○ নিট্‌ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীততণ্‌হো অনঙ্গণো,
আচ্ছিন্দি ভবসল্লানি অন্তিমো'য়ং সমুস্‌সয়ো।

যিনি লক্ষ্যে উপনীত, সন্ত্রাসহীন, তৃষ্ণামুক্ত ও নিষ্কলুষ হইয়াছেন, যাঁহার ভবকন্টক উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অন্তিম দেহধারণ (অর্থাৎ তাঁহার আর পূনর্জন্ম হইবে না।

○ বীততণ্‌হো অনাদানো নিরুত্তিপদকোবিদো,
আক্‌খরানং সন্নিপাতং জঞ্‌ঞা পূব্‌বাপরানি চ,
স বে অন্তিমসারীরো মহাপঞ্‌ঞো
(মহাপুরিসো)'তি বুচ্চতি।

যিনি তৃষ্ণামুক্ত, অনাসক্ত, নিরুক্তিপদকুশল (অর্থাৎ ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দার্থ নির্ণয়ে সুদক্ষ) এবং অক্ষরসমূহের সন্নিবেশ কৌশল ও গৌর্বাপর্য প্রয়োগ জানেন, সেই অন্তিতদেহধারী মহাপ্রজ্ঞাই মহাপুরুষ নামে অভিহিত।

(বুদ্ধ)

## ১। শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথেরোর বংশ পরিচিতি

আদিপুরুষ

খেলা রাম সিংহ-১৭৭৫ খ্রিঃ

- ১ম স্ত্রীর গর্ভে
  - সেবারাম সিংহ১৮২৫ খ্রিঃ
    - হরশচন্দ্র সিংহ ১৮৭০ খ্রিঃ
      - গিরিশ সিংহ
        - ক) নগেন্দ্র সিংহ
        - খ) হীরালাল সিংহ
        - গ) বীরেন্দ্র সিংহ
    - গগন চন্দ্র সিংহ
      - রাজকুমার সিংহ- ১৯০১খ্রিঃ
        - ক) গোবিন্দ সিংহ
        - খ) দেবেন্দ্র সিংহ
        - গ) যাদব সিংহ
        - ঘ) শ্রীমতি বিরাজা সিংহ
        - ঙ) সুরেশ সিংহ
        - চ) ধর্মরক্ষিত মহাথেরো জন্ম ১৩৪৫বঃ ১১মাঘ, বুধবার।
        - ছ) যতীন্দ্র সিংহ
- ২য় স্ত্রীর গর্ভে
  - ভীম সিংহ -অর্জুন সিংহ -নকুল সিংহ
    - মহিম সিংহ
      - অশ্বিনী সিংহ

## ২। কোঁয়ার গ্রামের নন্দরাম সিংহ বংশের পরিচিতি।

আদিপুরুষ

নন্দরাম সিংহ ১৮৮৮খ্রিঃ

- ভৈরব-
  - বৈকুণ্ঠ সিংহ
    - রমনী সিংহ - জগদীশ সিংহ
- শরৎ-
  - প্রেমলাল সিংহ
    - শাক্য সিংহ - ধর্মপাল ভিক্ষু
- বসন্ত-
  - ক্ষিতীশ সিংহ
    - বিধান সিংহ- সুভাষ সিংহ- সমীর সিংহ -
- পূর্ণচন্দ্র
  - প্রকাশ সিংহ
    - বিজয় সিংহ

## ৩। গোপাল সিংহের বংশ পরিচয়।

গোপাল সিংহ ১৮৭৫ খ্রিঃ

- শোভারাম- ১৮৯০ খ্রিঃ
  - নিবারন সিংহ, চিত্ত সিংহ, তারক সিংহ, রবীন্দ্র সিংহ,
    - নিকুঞ্জ সিংহ, বিপুল সিংহ
- ধনীরাম

# ৪। মেম্বার অনিল সিংহের বংশধর

আদিপুরুষ

কৈয়া সিংহ ( আনুমানিক ১৬০০ খৃষ্টাব্দ)

↓ তৎপুত্র

কনক সিংহ ( আনুমানিক ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ)

↓ তৎপুত্র

গোলক সিংহ ( আনুমানিক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ)

↓ তৎপুত্রদ্বয়

১) মহেশ সিংহ, ২) কবিরাজ নবীন সিংহ (১৯০২ খৃষ্টাব্দ)

↓ তৎপুত্রত্রয়

১) শীতল সিংহ ২) অনিল সিংহ ৩) লালমোহন সিংহ

বিজয় সিংহ - ইন্দ্রজিৎ সিংহ

শ্যামল সিংহ - কমল সিংহ - সজল সিংহ

↓ তৎপুত্রত্রয়

১) সমর সিংহ ২) অমর সিংহ ৩) নির্মল সিংহ

# প্রকাশিকার প্রতিবেদন

আমার জ্ঞাতি বড় ভাই পূজনীয় ধর্মরক্ষিত মহাথের বর্তমান বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে একজন সাংঘিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর আজ পর্যন্ত বিশটি মূল্যবান গ্রন্থ সহ প্রায় একশত আশিটি গবেষণা প্রবন্ধ বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। বাগমারা উচ্চ বিদ্যালয়, লালমাই ডিগ্রী কলেজ এবং নিজ প্রতিষ্ঠিত সম্বোধি পালি ও সংস্কৃত কলেজে পালি এবং সংস্কৃত শিক্ষাদান করে একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী হিসেবে জন সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তিনি "সাহিত্য সাধনায় মহামান্য দশম সংঘরাজ" নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করার প্রস্তাব দিলে আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সমরসিংহ আমেরিকার নিউইয়র্কস্থিত UNDP তে চাকুরীরত, সে বর্তমানে আমেরিকায় "বাংলাদেশ বুড্ডিষ্ট সেন্টার অব্ আমেরিকা" এর সভাপতি; দ্বিতীয় পুত্র অমর সিংহ, ঢাকায় একটি এন, জি, ও তে চাকুরীরত এবং তৃতীয় পুত্র নির্মল সিংহ(ইউ পি সদস্য) এর সাথে আলাপ করে এ গ্রন্থ ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমার পরপারগত স্বামী লালমোহন সিংহ মহোদয়ের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।গ্রন্থ ছাপানো জনিত পুণ্য লাভে তিনি পারলৌকিক সুখলাভ করুক।

**এ কামনা করি।**


গ্রাম ঃ- কোঁয়ার, ডাক ঃ- চাঁন্দগাঁও
লাকসাম, কুমিল্লা।
তাং- ১৬ ডিসেম্বর-২০০৪খ্রিঃ

বিনীতা প্রকাশিকা
শ্রীমতি কানন বালা সিংহ

# স্বর্গীয় লাল মোহন সিংহ

মদীয় স্বর্গীয় স্বামী লাল মোহন সিংহের পারলৌকিক
মঙ্গল কামনায় এবং আমার পুত্রত্রয় ও আদরের
বৌমা সহ নাত-নাতনীদের সুখময় দীর্ঘায়ু কামনায়
এবং মহামান্য দশম সংঘরাজের শুভাশিস্
লাভেচ্ছুক হয়ে এ গ্রন্থখানা উৎসর্গ করিলাম।

তাং- ১৬ ডিসেম্বর-২০০৪খ্রিঃ
০২ পৌষ ১৪১১ বাঃ

বিনীতা প্রকাশিকা
শ্রীমতি কানন বালা সিংহ

# সাহিত্য সাধনায় মহামান্য দশম সংঘরাজ

## সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১। | সূচনা | ১ |
| ২। | কর্মতত্ত্ব | ৫ |
| ৩। | পুগ্গল গঞ্ঞত্তি | ৮ |
| ৪। | বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে | ৯ |
| ৫। | বোধিচর্যাবতার | ১৪ |
| ৬। | বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভাতৃত্ব সংঘ সম্মেলন ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ | ১৬ |
| ৭। | ব্রহ্ম বিহার | ১৮ |
| ৮। | ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান পতন | ২০ |
| ৯। | প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ | ২১ |
| ১০। | সাধনার অন্তরায় | ২২ |
| ১১। | উপসংঘরাজ গুণালংকার মহাস্থবির | ২৫ |
| ১২। | চর্যাপদ | ২৭ |
| ১৩। | রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি | ২৯ |
| ১৪। | বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা | ৩০ |
| ১৫। | সাম্য সৌম্যই শক্তির উৎস | ৩১ |
| ১৬। | বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ এবং পঞ্চবুদ্ধ | ৩২ |
| ১৭। | পরিশিষ্ট | ৩৪ |

# সাহিত্য সাধনায় মহামান্য দশম সংঘরাজ

## ১। সূচনা ঃ

সাহিত্য হচ্ছে মানুষের মনের মণিকোঠায় সুপ্ত সুন্দর ভাবাবেগের প্রতিভাত উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। মনের গভীর হতে যখন সুন্দর ভাবরাশি উৎসারিত হয়ে ভাব ভাষার মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, তখন সে ভাবরাশির পীযূষ ধারায় মন আপ্লুত হয়ে মনের মধ্যে অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি করে। তখন ভাবুক মন সে উৎকর্ষিত সুন্দরতম ভাবরাশির অতলান্তিকে অবগাহন পূর্বক জীবন দর্শনের মূল্যাংকন করে। বাস্তব দৃষ্টিতে সৃষ্ট সকল সাহিত্যই, সাহিত্য পদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। এর কারণ হচ্ছে, সকল সাহিত্যিকের সৃষ্ট সাহিত্য মানুষের মনোরাজ্যে আবেগ সৃষ্টি এবং মনের উৎকর্ষতা সাধন করতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত পক্ষে যিনি সুলেখক তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা সর্বোপরি ভবাগার হতে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে, সে সাহিত্য মানুষের মনে বাঙ্ময়ীরূপে প্রকাশিত হয়ে চিত্তাকাশে ভাব সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ সাহিত্যই অসংখ্য সাহিত্য অনুরাগীদের মনোমন্দিরে স্থান করে নেয়, মহাকালকে অতিক্রম করে বর্তমানে। সূর্যালোকে নিম্নগামী পদ্মকোরক যেরূপ উর্দ্ধগামী হয়, তেমনই বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যের যাদুস্পর্শে নীচু মনও উচু হয়। তখন সাহিত্য আপন মনে সৃষ্ট কলুষতাকে দূরীভূত করে সুন্দরের সাধনায় নিজকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। সুখপাঠ্য ও মনোজ্ঞ অর্থবহ সাহিত্য পাঠে শুষ্ক মনও সজীবতা লাভ করে। স্বর্গীয় সুধা পানে অতৃপ্ত মনও তৃপ্তি লাভ করে এ পার্থিব জগতে।

পার্থিব জগতের সর্বপ্রকার লোভ লালসার প্রতি বীতস্পৃহ মহাজ্ঞানী পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট বৌদ্ধ চিন্তাবিদ, সাহিত্যানুরাগী ও সমাজ হিতৈষী। তিনি আজীবন অনাগরিক জীবন যাপন করে আত্মহিত ও পরহিত সাধনায় অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্য ভান্ডারকে সুসমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে ভাবের গভীরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং প্রকাশ করার মৌলিক গুণ থাকায় লেখাগুলো প্রাণবন্ত হয়েছে। তাঁর সুচিন্তিত ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য প্রবন্ধাদি সাহিত্যাঙ্গণে মাইল ফলক হিসেবে

দন্ডায়মান রয়েছে। এ সব গ্রন্থ রচনার মধ্যে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে আঁচ করা সম্ভব।

পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের কৈশোর বয়সে সংসারের অসরতা উপলব্দি করে ভগবান বুদ্ধ প্রদর্শিত প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে পদার্পন করেন। তখন হতে তিনি ভগবান বুদ্ধের প্রদর্শিত দুইটি ধূরের মধ্যে গ্রন্থ ধূরকে জীবনের আদর্শ বিবেচনা করে ত্রিপিটক গ্রন্থ পঠন-পাঠনের জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় নৈর্বাণিক ধর্মের ভাবস্রোতে নিজকে ভাসিয়ে দিয়ে চৌরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ সমন্বিত বিশাল ত্রিপিটকের অমৃত সাগরের অপর পারে যাওয়ার জন্য একজন নির্ভীক নাবিক রূপে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি দীর্ঘ বছর ত্রিপিটকের অমৃত সাগরে অবগাহন করে রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর জীবনের সফলতার পেছনে যাঁরা পথিকৃৎ রূপে তাঁর জীবনকে একজন কৃতবিদ পন্ডিত রূপে গড়ে তুলেছেন তাঁরা হলেন ভগবান বুদ্ধের প্রদর্শিত, জ্ঞান রাজ্যের বরপুত্র উপমহাদেশের প্রখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিত পূজনীয় **শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির** ও **পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির** অন্যতম। মহাথের ১৯৩৪ সালে কলকাতা মহানগরীর প্রাণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত ধর্মাংকুর বিহারে অধ্যয়ন কালে অনেক স্বনামধন্য পন্ডিত, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের সান্নিধ্য লাভ করায় তাঁর জ্ঞানচক্ষু উম্মেলিত হয়েছিল। পালি ভাষা চর্চার পাশাপাশি তিনি একাগ্রমনে সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ত্রিপিটকের অটঠ্কথা সহ বিভিন্ন সাহিত্য দর্শন পাঠ করে যৌবন বয়সেই একজন কৃতবিদ বৌদ্ধ পন্ডিত রূপে তিনি বৌদ্ধ সমাজে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর এ সাধনলব্দ জ্ঞান শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, অসাধারণ সাধনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনার মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান-সাধনার ধারাকে চলমান রেখেছিলেন। শ্রদ্ধা মিশ্রিত জ্ঞানের সমন্বয়ে রচিত গ্রন্থরাজি সুখপাঠ্য হয়ে প্রকাশ পাওয়ায়, লোক সমাজে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কস্মিনকালেও ক্ষীণ হবেনা বলে আমার বিশ্বাস। তিনি অন্তর গুহায় সুপ্ত ভাবরাশিকে লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ করে নিজকে ধন্য করেছেন। তার পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত দেহ লেলিহান অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হয়ে ভস্মে পরিণত হয়েছে সত্যি, কিন্তু তিনি একজন আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষু, কৃতবিদ পন্ডিত, গবেষক, চিন্তাবিদ দশম

সংঘরাজ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক রূপে চিরদিন বেঁচে থাকবেন যুগান্তকাল ধরে মানুষের মনোমন্দিরে।

বুদ্ধ ভাষিত প্রাকৃত জনের ভাষা পালি ভাষা ছিল মহাথেরোর জীবন দর্শনের উৎকর্ষ সাধনার আদর্শ ভাষা। তাই তিনি প্রাচীন বৌদ্ধরাজ্য সমতটের (বর্তমান কুমিল্লা জেলা) আদর্শ ধরে রাখতে পালি ভাষা চর্চা, পঠন-পাঠন সহ এ ভাষার প্রচার ও বিস্তৃতির জন্য মহান ব্রত গ্রহণ করেন। এ মূল্যবোধে তিনি জীবনের প্রথম ভাগে লাকসাম উচ্চ বিদ্যালয়ে পালি ভাষা প্রবর্তন করেন। এরই সাথে আলোকদিয়া শাক্যমুনি বিহারে সূর্যমণি পালি টোল ও গ্রন্থাগার স্থাপন করে পালি বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে হরিশ্চর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে পালি ভাষার শিক্ষক পদে নিয়োজিত হয়ে দীর্ঘ বছর শিক্ষকতা করেন। আলোকদিয়া হতে বরইগাঁও কনকচৈত্য বিহারে এসে পালি কলেজ, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সহ আরো কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে জড়িত হয়েও তিনি নিরলস ভাবে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। বৃদ্ধাবস্থায় কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ব্যতীতও পন্ডিত শান্তরক্ষিত মহাথেরোর অনুদিত বিশালকায় মিঃ রিচ্‌ডেভিটের পালি হতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পালি অভিধান পরিশোধকের কাজ করে তিনি পালি ভাষা বিষয়ে যে পান্ডিত্য ও মেধা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও তাঁর এ অসাধারণ কৃতিত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি বাঙ্গালী জাতি ও নিজ সম্প্রদায়ের হিতকল্পে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন যা তাঁর কর্ম সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। সর্বোপরি তাঁর জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সাধনার ফলশ্রুতিতে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে সু-সমৃদ্ধ করেছে যা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি তাঁর গ্রন্থাবলী সমালোচনা বা মূল্যাংকন করার জন্য নয়, সাহিত্যাঙ্গণে তাঁর অমর কীর্তিকে ধরে রাখা যুগপৎ এহেন মহাপুরুষের অসাধারণ জীবন দর্শনের প্রতি সম্পৃক্ততা প্রকাশ ও তাঁর ভাবে নিজকে ভাবিত করার অভীস্পায় এ নিবন্ধের অবতারণার লক্ষ্য। তিনি কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে সাঙ্ঘিক কর্ম সম্পাদনে নিমগ্ন থেকেও অবসর সময়ে জ্ঞান সাগরের অতলান্তিকে ডুব দিয়ে ডুবুরীদের মত রত্ন আহরণ করে লিখনী দ্বারা সমাজকে যে উপহার দিয়েছেন,নিম্নে তাঁর সে সব গ্রন্থ গুলোর নাম উল্লেখ করলাম,

| গ্রন্থের নাম | প্রকাশকাল | প্রকাশক |
|---|---|---|
| ১। কর্মতত্ত্ব (প্রথম সংস্করণ) | ১৯৬০ সাল | গগন চন্দ্র সিংহ, কুমিল্লা। |
| ২। পুগ্গল পঞ্ঞত্তি (অনুবাদ) | ১৯৬৩ সাল | অরুন কুমার বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। |
| ৩। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে | ১৯৭৬ সাল | বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, চট্টগ্রাম। |
| ৪। বোধিচর্যাবতার (অনুবাদ) | ১৯৭৭ সাল | বাংলা একাডেমী, ঢাকা। |
| ৫। মালয়েশিয়া ভ্রমণ | ১৯৭৭ সাল | হেমেন্দু বিকাশ ড়াড়ুয়া, চট্টগ্রাম। |
| ৬। ব্রহ্ম বিহার (অনুবাদ) | ১৯৭৯ সাল | পালি বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম। |
| ৭। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতন (অনুবাদ) | ১৯৭৯ সাল | শ্রীমতি বিমলাময়ী বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। |
| ৮। প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ (অনুবাদ) | ১৯৮১ সাল | ডাঃ শুভঙ্কর বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। |
| ৯। সাধনার অন্তরায় | ১৯৮৩ সাল | পালি বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম। |
| ১০। উপসংঘরাজ গুণালঙ্কার মহাস্থবির | ১৯৮৫ সাল | পালি বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম। |
| ১১। চর্যাপদ | ১৯৯০ সাল | শ্রী রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। |
| ১২। রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি | ১৯৯৭ সাল | শ্রী সঞ্জয় কুমার বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। |
| ১৩। বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা | ১৯৯৭ সাল | শ্রী শচীভূষণ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। |
| ১৪। সাম্য সৌম্যই শান্তির উৎস | ১৯৯৯ সাল | শ্রী রতন কুমার সিংহ, কুমিল্লা। |
| ১৫। বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও পঞ্চবুদ্ধ | ২০০১ সাল | শ্রী জহর চন্দ্র সিংহ, কুমিল্লা। |

লেখকের এসব গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ প্রকাশনা ব্যতিতও বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে অনেক মূল্যবান মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছে। নিজে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও 'বোধিপত্র' নামে একটি এবং রীতিমত 'বিশ্বশান্তি প্যাগোডা' সাময়িকীতে নিবন্ধ লেখাসহ পত্রিকা সম্পদনা করে পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর ষাট দশক হতে একবিংশ শতাব্দি প্রথম দশকের প্রারম্ভে তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন, নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলোর পরিচিতি তুলে ধরছি।

## ২। কর্মতত্ত্বঃ-

মহামান্য দশম সংঘরাজ পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের পালি কলেজে ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদেরকে শিক্ষাদান কালে প্রতিনিয়ত ধর্মালোচনা, গবেষণা ও সাহিত্য চর্চায় আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও সমাজের বিভিন্ন হিতকর্মে তাঁর দিন অতিবাহিত হত। কলকাতা ধর্মাংকুর বিহারে অধ্যয়ন কালে তাঁরই শিক্ষাগুরু প ধর্মাধার মহাস্থবিরের "সঙ্ঘ শক্তিতে" প্রকাশিত "কর্মতত্ত্ব" সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে গ্রন্থ লেখার জন্য অনুপ্রাণিত হন। তখন হতেই লেখক চিন্তা ভাবনার মধ্যে কর্মতত্ত্ব সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব পেয়েছেন, এর উপর নির্ভর করেই 'কর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৯০ সালে **শ্রী গগন চন্দ্র সিংহ** ও তদীয় পত্নী **শ্যামাবতী সিংহের** অর্থানুকূল্যে, **ড. বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের** সার্বিক সহযোগিতায় কলকাতার ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস হতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। লেখকের প্রথম গ্রন্থ পাঠে বিদগ্ধ পন্ডিত সমাজ তাঁর মূল্যবান লেখার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। লেখক কুমিল্লা জেলার সগোত্রীয় ভিক্ষু শ্রামণদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে বৌদ্ধ সমাজের অন্ধকারাছন্ন যুগে যে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রামণ পতনোম্মুখ, কুসংস্কারাছন্ন বৌদ্ধ সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের দীপ শিখা প্রজ্জ্বলন করে সমাজ কাঠামোকে জীবন্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আলীশ্বর নিবাসী **ভিক্ষু শ্রদ্ধানন্দ** ও **শ্রামণ শরণতিষ্য** অন্যতম ছিলেন। লেখক পরপারগত এ দুইজনের অবদানের কথা ভুলতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থটি তাঁদের নামে উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছেন,-

**"অনিত্য সংসার কুঞ্জে**
**ত্যাজিয়া স্বজন পুঞ্জে,**
**অকালে ঝরিয়া গেলে ভব পরপার**
**ফুটিবার ছিলে ওগো**
**ফুটিলে না আর।"**

৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন, তাঁরই শিক্ষাগুরু পন্ডিত ধর্মধার মহাস্থবির। তিনি দার্শনিক কবি শিল্‌হন মিশ্রের রচিত "শান্তিশতকম্" গ্রন্থের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। সে শ্লোকে কর্মের প্রাধান্যই প্রদর্শিত হয়েছে। সে শ্লোকটি হলঃ-

**"নমস্যামো দেবান্ননু হতবিধেস্তেপি বশগাঃ,**
**বিধির্ব্বন্দ্যাঃ সোহপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ।**
**ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,**
**নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি নযভ্যঃ প্রভবতি।"**

দেবগণকে নমস্কার করবনা তারা বিধাতার বশীভূত, অতএব বিধাতাকে নমস্কার করি, তিনি অভীষ্ট ফল প্রদান করবেন। না-তাও সম্ভব নয়, কেননা তিনিও একমাত্র কর্মের ফলই প্রদান করে থাকেন। তবে, ফলকেই নমস্কার করা যাক, না ফলই কর্মাধীন, অতএব দেবগণই বা কি, বিধাতাই বা কি, কেহই অভীষ্ট ফল প্রদান করতে পারেনা। সুতরাং কর্মকেই নমস্কার করা যাক, কেননা বিধিও তার উপর প্রভূত্ব করতে পারেনা। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফলই জীবগণকে সুখ, দুঃখ ও পরমায়ু বিধান করে বলে উল্লেখ রয়েছে যেমন,-

**"পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্মং গ্রহরূপেন সংস্থিতম্,**
**তেনায়ুর্লভতে জন্তুঃ সুখং দুঃখঞ্চ জন্মনা"**

পূর্বজন্মের কৃতকর্ম গ্রহরূপে স্থিত হয় এবং জীব তৎপ্রভাবে জন্মের সহিত সুখ-দুঃখ ও পরমায়ু লাভ করে থাকে।

লেখক তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যের দ্বারা এ অখন্ডনীয় কর্ম ফল ও কর্ম বিপাককে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অকাট্য মতামত গ্রন্থটির প্রতি অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ছয় অধ্যায়ে বিন্যস্ত ক্ষুদ্রাকারের এ গ্রন্থটির মধ্যে দুর্লভ মানব জীবনের মোক্ষম বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। একজন মানুষের কি করা কর্তব্য, তাঁর দুর্লভ মনুষ্য জন্মের স্বার্থকতা বয়ে আনার জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, এ ভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে এ গ্রন্থে। লেখক সর্বমোট সাতটি অধ্যায়ে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে তাঁর যুক্তিতর্ক তুলে ধরেছেন। সে সাতটি অধ্যায় হল- ক) বিশ্ব বৈষম্যের কারণ, খ) কর্ম ও ফল, গ) কর্ম বিভাগ ও বিপাক, ঘ) দৈব পুরুষকার, ঙ) কর্মের সুক্ষ্মবিচার, চ) কর্ম বিমুক্তি ও ছ) প্রতীত্য সমুৎপাদ।

লেখক প্রসঙ্গত তোদেয়্য ব্রাহ্মণ পুত্র শুভ মানব জীবগণের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন, সে বিষয়ে ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করলে ভগবান বুদ্ধ যথার্থ উপদেশচ্ছলে বললেন-

**"কম্মস্সকা মাণবক সত্তা, কম্মদায়কা, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্ম পটিসরনা, যং কম্মং করিসস্তি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্সদায়দা ভবিস্সন্তি 'তি। কম্মং সত্তে বিভজতি, যদিদং হীনপ্পনীতত্তায়ায়তি।"**

হে মাণবক! প্রাণীগণ নিজ নিজ কর্মাধীন, কর্মই প্রাণীগণের একান্ত আপন বা স্বকীয়। এরা কর্মের উত্তরাধিকারী, কর্মই জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু ও প্রকৃষ্ট আশ্রয়। যে যেমন কর্ম সম্পাদন করে, সে তেমন ফলই ভোগ করে থাকে। এ বিষয়ে কর্ম বিভঙ্গ সূত্রে সুবিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। লেখক তাঁর গ্রন্থের কর্মবিভাগ ও বিপাক অধ্যায়ে বিভিন্ন কর্মের দার্শনিক তত্ত্বকে বিভিন্ন উপমা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পাঠক সমাজের মনে আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এ অধ্যায়ে জনক কর্ম, উপস্তম্ভককর্ম, উৎপীড়ক কর্ম ও উপঘাতক কর্ম সম্পর্কে সহজ সরলভাষায় যুক্তিতর্কের অবতারনা করে গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। এর ফলশ্রুতিতে লেখকের দার্শনিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। এ গ্রন্থটির গভীরতা দর্শনে লোক সমাজে প্রয়োজন রয়েছে বলেই তাইওয়ানে ১৯৯৮ সালে **"বুদ্ধ এডুকেশন ফাউন্ডেশন"** পুনরায় সুন্দর প্রচ্ছদে প্রকাশ করে লেখকের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এ গ্রন্থটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

## ৩। পুগ্গল পঞ্ঞত্তি ঃ-

পুগ্গল অর্থ মানুষ। পঞ্ঞত্তি অর্থ প্রজ্ঞপ্তি। অর্থাৎ পুগ্গল পঞ্ঞত্তির আভিধানিক মানে হল মানুষের শ্রেনীবিন্যাস। এরই রক্তমাংসে গড়া মানুষের মনোবৃত্তির দ্বারা বিভিন্ন ভাগে বিভাজ্য। এরই সম্যক বিচার বিশ্লেষণ রয়েছে ৭টি অভিধর্ম পিটকের মধ্যে এ গ্রন্থটিতে। ত্রিপটকের মধ্যে অভিধর্ম পিটকে মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ রয়েছে। অভিধর্ম পিটকে কথাবত্থু গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য লেখক কারা ছিলেন, তা জানা যায়না। আচার্য পরম্পরা কিংবদন্তি অনুসারে ভগবান বুদ্ধ অভিধর্মের জটিল বিষয়গুলো সাধারণের সহজবোধ্য হবেনা মনে করে মর্তলোকে তা প্রচার করেননি। ভগবান বুদ্ধ এয়ত্রিংশ স্বর্গে দেবকায়া মাতা মহামায়াকে সম্মুখে উপস্থিত রেখে দেবসভায় অভিধর্ম দেশনা করেছিলেন।

পন্ডিতদের মতে খৃষ্টপূর্ব ২৯ সনে শ্রীলংকার রাজা **বট্টগামনি অভয়ের** রাজত্বকালে এ গ্রন্থটি সর্ব প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে শ্রীলংকায় সর্বপ্রথম তালপত্রে সিংহলী অক্ষরে ত্রিপিটক লেখা হয়েছিল। বর্তমানেও **শ্রীলংকায় মাদিপোলা** জেলার **আলোক বিহারে** তালপত্রে ত্রিপিটক লেখা হচ্ছে। ২০০১ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে শ্রীলংকা ভ্রমণকালে পাহাড় বেষ্টিত গুহা মন্দির সহ তালপত্রে লিখিত ত্রিপিটক দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

অভিধর্ম পিটকের এ অমূল্য গ্রন্থটি ১৯১১ সালে শ্রদ্ধেয় **জ্ঞান তিলোক স্থবির** জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। ডঃ বিমলা চরণ লাহা ১৯২৩ সালে ইংরেজীতে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তখন বিশ্বের পন্ডিত সমাজ এ অমূল্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হন। কিন্তু বাংলা ভাষীদের নিকট তা অজ্ঞাতই রয়ে গেল। ১৮৮৩ সালে রোমান অক্ষরে **লন্ডন পালি টেক্স্ট সোসাইটি** প্রকাশ করে। পন্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের প্রথম ব্যক্তি যিনি অভিধর্ম পিটকের এ গ্রন্থটির বাংলায় অনুবাদ করে বৌদ্ধ সমাজকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৬৩ সালে বিশিষ্ট দায়ক **শ্রী অরুন কুমার বড়ুয়া** ও তদীয় পত্নী **শ্রীমতি প্রমিলা বালা বড়ুয়ার** অর্থানুকুল্যে এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থটি ১৬২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ৪০পৃষ্ঠা রয়েছে পরিশিষ্ট গ্রন্থটির মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন পন্ডিত **শ্রী ধর্মাধার মহাস্থবির**। লেখক এ গ্রন্থ অনুবাদ করার সময় ডঃ বিমলা চরন লাহার **'পুগ্গল পঞ্ঞত্তির'** ইংরেজী

অনুবাদের সাহায্য নিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে মন-মানসিকতা, আচার-নিষ্ঠা-ব্যবহারে মানুষের মধ্যে যে ভাব পরিদৃশ্য হয়, এরই বিস্তৃত রূপরেখা এ গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে।

এ গ্রন্থে মাতিকা, পুগ্গল পঞ্ঞত্তিয়ো, একক নিদ্দেস, দসক নিদ্দেস পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায় রয়েছে। এসব অধ্যায়ে যুক্তি তর্কের উদাহরন ও উপমার সাহায্যে মানুষের মধ্যে প্রকারভেদ কেন হয় তা বুঝাতে গিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের অবতারনা করা হয়েছে। পালি সাহিত্যে একজন কৃতবিদ পন্ডিত বলেই এ গ্রন্থের অনুবাদক পূজনীয় **শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের** এরূপ একটি তথ্য বহুল গ্রন্থ সহজ সরল বাংলায় অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। এর দ্বারা পালি ভাষায় তাঁর যে অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে তা সূর্যালোকের মত প্রকাশ পেয়েছে। অভিধর্ম পিটকের এ অমূল্য গ্রন্থটি ২০০০ সালে তাইওয়ানের **"বুদ্ধ এডুকেশন ফাউন্ডেশন"** পুনঃ মুদ্রন করে। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য অনুরোধ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন, এ গ্রন্থের মূল্যায়ন করার মত বৌদ্ধ সমাজে কতজন লোক আছেন? বুঝবার কথা অনেক পরে, বাস্তবপক্ষে কয়জন এ গ্রন্থ পাঠ করেছেন বা করবেন?

## ৪। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে ঃ-

পৃথিবীর সকল সচেতন নাগরিকের নিকট মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা জন্মদায়িনী মাতার মতই পূজনীয়া। তাই পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশ মাতৃকার সূর্য সেনানীরা নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তারা নিজ প্রাণের বিনিময়ে জাতিকে উপহার দিয়েছেন "স্বাধীনতা"। বাঙালী সন্তানেরাও ১৯৪৭ সন হতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের দ্বারা-শাসিত-শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টিকাল হতে। তাই ১৯৭১ সালে **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের** আহ্বানে বাঙলার মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন এ পুস্তকের লেখক পূজনীয় জোতিঃপাল মহাথের মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ দুপুর রাতে পাক-হানাদার বাহিনী বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মানুষের উপর নগ্ন হামলা চালায়। হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরেরা নির্বিচারে বাঙালীদের হত্যা করতে শুরু করে। ঘরবাড়ী পুড়ে ছাই

করে দেয়। মা বোনদের ইজ্জত কেড়ে নেয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদেরকে হত্যা করে। জাতির এমনি সংকট সময়ে পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বংলাদেশ সরকারের আহ্বানে, ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বৌদ্ধরাজ্যের জনমত আদায়ের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গমণ করেন। আমার জানা মতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গুরুদের মধ্যে একমাত্র পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের এবং এ গ্রন্থের লেখক কুমিল্লা কনকস্তূপ বিহারের অধ্যক্ষ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসাবে কাজ করেন। পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যে অবদান রেখেছে, এরই বাস্তব ঘটনা এ গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করনের পরিচিতি লিখেছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য **অধ্যাপক আবুল ফজল**, তিনি পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের সম্পর্কে লিখেছেন,-

"মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা পন্ডিত ও নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে মহান ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ছিল একদিকে মিথ্যার সাথে আপোষহীন, অন্যদিকে ছিল অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর। ..... প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকে শুরু করে শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ প্রধান দেশগুলোতে ব্যাপক সফরের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীর নৃশংস নির্যাতন ও গণহত্যার সঠিক বিবরন প্রচার ও তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠনে প্রভূত সহায়তা করেছিল।"

লেখক তাঁর দ্বিতীয় সংস্করনে (১৯৯৭সাল) বক্তব্যে যে সমবেদনা ও দেশাত্ববোধের কথা ব্যক্ত করেছেন, তা একজন সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের বক্তব্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তিনি বলেছেন-

"আমি রাজনীতিজ্ঞ নই। রাজনীতি আমার সম্পূর্ন অনধিগম্য। তথাপি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই মাতৃভূমি স্বদেশকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসায় অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক। মাতৃভূমির প্রতি নিদারুন লাঞ্ছনা অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও দেশাত্মবোধ পরায়ন ব্যক্তির মত আমাকেও বিক্ষুদ্ধ করে তুলেছিল ১৯৭১ সনে। অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে পারিনি, নিরীহ জনগণের জুলুমের

অবিচারের সাথে আপোষ করিনি। ধর্মের দোহাই দিয়ে অত্যাচারী পাপীষ্ঠদের দোসর সেজে বাঁচার চেষ্টা চালাইনি। মিথ্যা প্রতারনার আশ্রয় দিইনি। জীবন্ত মানুষকে যমের হাতে তুলে দেইনি। মানুষের কাঁচা মাংস রাক্ষসের মুখে পুড়ে দেইনি। বরং দৃঢ়তার সহিত হানাদার বাহিনীর হাত থেকে স্বদেশের মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক রূপে সংগ্রামে অবতীর্ন হয়েছিলাম। আমার সে সংগ্রাম তথাগত বুদ্ধের নির্দেশিত অহিংস নীতিতে যতটুকু পেরেছি ততটুকু করেছি।

পাক-হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার সম্পর্কে লেখক তাঁর নিজস্ব অনুভূতি এরূপভাবে ব্যক্ত করেছেন, "জীব সৃষ্টির নীতি যতদিন জগৎ বক্ষে বিদ্যমান থাকবে, ততদিন কেউ ভুলতে পারবেনা যে- ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দুইশ ছিষট্টি দিন রক্তাক্ত বিভীষিকাময় বাঙালী জীবনের দিনগুলোর কথা। বিশ্বকোষ রক্তাক্ত বর্ণমালায় সকরুণ অধ্যায় লিপিবদ্ধ থাকবে চিরদিনের জন্য। ..... ২৫ বছরের পূর্ব বৃত্তান্তের অনুভূতি ও উপলব্দি করতে হলে তার বয়সের মাপকাঠি হতে হবে অন্তত ৪০ বছর। তথাপি হবে না যদি তিনি দেশপ্রেমিক সচেতন ব্যক্তি না হন। ইতিহাস কলংকিত হউক আর উচ্চ প্রশংশিত হোক ইতিহাসকে সচেতন ব্যক্তি কখনো ভুলে না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভ করে ত্যাগের আকারে অথবা গ্রহণের আকারে। ইতিহাসকে ভুললে জীবন সমাজ কিংবা রাষ্ট্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তিনি স্বল্প পরিসরে এ ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সম্বলিত পুস্তিকাটিতে প্রারম্ভেই পাকিস্তানের বৈষম্য মূলক শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর গণভোটে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেও তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার চাল-চাতুরীর কারণে শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসীন হতে পারেননি। ইয়াহিয়ার আদেশেই বর্বর সেনাবাহিনী ২৫শে মার্চ ১৯৭১ গভীর রাতে নিরীহ বাঙালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা বাংলাদেশে বাঙালী নিধন যজ্ঞ আরম্ভ হয়। শহর-বন্দর-হাট-বাজার, গ্রামে-গঞ্জেও পাক হানাদার বাহিনী নির্বিচারে বাঙালীদের উপর নির্মম নির্যাতন সহ বধ করতে থাকে। সে রোষে এ গ্রন্থের লেখক-পূজনীয় **জোতিঃপাল মহাথেরও** বাদ পরেননি। তাই তিনি নিরূপায় হয়ে ১৭ এপ্রিল নিজ গ্রাম বড়ইগাঁও কনকচৈত্য বিহার চত্বরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জনসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের মায়া ত্যাগ করে ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৯ এপ্রিল

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কাঁঠালিয়া গিয়ে উপস্থিত হন। পরবর্তী সময়ে আগরতলায় পৌছেন। সর্বপ্রথম তিনি ভারত ও দেশ-বিদেশের ৩৫ জন সাংবাদিকের নিকট পাক-হানাদার বাহিনীর নিরীহ বাঙালীদের উপর অমানবিক অত্যাচার সহ কিভাবে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, এর একটি হৃদয় বিদারক বর্ণনা লিখিত ভাবে তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসাবে পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরো'র অবদান হচ্ছে, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ২১/৭/১৯৭১ তাং, সকাল ৯ টায় সাক্ষাৎ করেন। বাঙ্গালিরা সহসাই যাতে তাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারে, সেজন্য অবেদন করেন। তখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বললেন-"সবকে তো একী বাদ হ্যায়, ইস লিয়ে ম্যায় সোস্তাহুঁ ক্যায়া করনা।" মহাথের বাংলাদেশ মিশনের পক্ষে জনার ফকির সাহাবুদ্দিন সহ ৭/৮/১৯৭১ তাং শ্রীলংকায় গমন করেন। সেখানে তিনি সরকারী বেসরকারী পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে দেখা করে বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যেভাবে বাঙালীদের উপর নির্যাতন এবং গণহত্যা চালিয়েছে তা জানালেন। এর মধ্যে বৌদ্ধরাও বাদ পড়েনি বলে জানান। তিনি শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মিসেস বন্দর নায়েকের নিকট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। পাক-হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যা, বিহার, বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের করুণ কাহিনীও তুলে ধরেন। কলম্বো বিমান বন্দর দিয়ে পাকিস্তানী বিমানে সৈন্য ও অস্ত্র এনে বাঙালীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে বলে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। তাঁর অনুরোধে শ্রীলংকার পাঁচজন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে পাকিস্তানী বিমান যাতে কলম্বো বিমান বন্দরে নামতে না পারে, নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য দরখাস্ত দেন। ফলশ্রুতিতে প্রধান মন্ত্রী **শ্রীমতি বন্দর নায়েক** কলম্বো বিমান বন্দরে পাকিস্তানী বিমান অবতরন করতে পারবেনা বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এক অপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। থাইল্যান্ড ও জাপান গিয়েও বৌদ্ধ প্রতিনিধিদের সাথে বাংলাদেশ পাক হানাদার বাহিনী যে অমাণবিক গণহত্যা সহ অত্যাচার চালিয়েছে এর প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। একজন বয়োবৃদ্ধ স্বনামধন্য মহাথের হিসাবে তিনি বিশ্ব বৌদ্ধদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছেন। আন্তর্জাতিক মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক

হিসাবে কাজ করে যে সফলতা অর্জন করেছেন সত্যি, কিন্তু এ সফলতার জন্য তিনি কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ না করায় বৌদ্ধ সমাজ মনোক্ষুন্ন।

৮ অক্টোবর, ১৯৭১ সনে বৌদ্ধ রাজ্য সফর শেষে আগরতলায় ফিরে আসেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন পরই সশিষ্য নিজের প্রতিষ্ঠিত বরইগাঁও কনকচৈত্য বিহারে ফিরে আসেন। পাক-হানাদার বাহিনীও তাদের দোসরদের নগ্ন ছোবলে সমস্ত বিহার ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়েছে দেখে মর্মাহত হন। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রত্নভান্ডার অমূল্য গ্রন্থ শূন্য লাইব্রেরীর করুণ অবস্থা দর্শন করে মর্মপীড়া বোধ করেন। তখন লেখক যে মন্তব্য করেন তা একজন উচ্চ মননশীল শিক্ষানুরাগীর পক্ষেই সম্ভব। নিম্নে কিছু অংশ উদ্বৃত করলাম-

"লাইব্রেরীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই অন্তরে বিষাক্ত শেল বিদ্ধ হয়ে গেল। পাঁচটি বড় বড় আলমারী ভর্তি বই পুস্তক ছিল কয়েক হাজার। দেশ-বিদেশ থেকে বহু দুস্প্রাপ্য দুর্মূল্যের অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করেছিলাম। আজ বহু বৎসর যাবৎ এই অঞ্চলের সাধারন শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষাকামীদের অনেক অশেষ কল্যাণ সাধন করে আসছে এই লাইব্রেরী। ..... এই লাইব্রেরী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে গন্ডীবদ্ধ নহে। সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ও সাধারন শিক্ষার বই পুস্তকে পরিপূর্ন ছিল। সারা জীবন বিন্দু বিন্দু করে অমূল্য সম্পদের যে বিরল সংগ্রহ আমি করেছি, আমার বাকী জীবনে আর কি তা সম্ভব? এখন..... টাকা পয়সা হাতে হলে প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য সম্ভার ও আসবাবপত্রের ক্ষতিপূরন করা সম্ভব, কিন্তু লাইব্রেরীর ক্ষতি অপূরনীয়। লাইব্রেরীর বই পুস্তক ভস্মে পরিনত না করে আমার জীবন বিদগ্ধ করা ভাল ছিল। আমার জীবনে এটা সর্বাধিক মর্মঘাতি ও অবিস্মরনীয় ঘটনা। কীটের নিকট বই পুস্তকের মূল্য যতখানি, মূর্খ লোকের নিকট গ্রন্থাদির মূল্য ততখানিই। ততোধিক কিছু যদি হয়, এতে গ্রন্থের কাগজে ঠোংগা বানানো পর্যন্তই মূর্খের মূল্যবোধ"। প্রাণের বিনিময়েও অমূল্য গ্রন্থ জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল এরই প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি সত্যিকার ভাবে একজন নিঃস্বার্থ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। তাই মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র "মুক্তিবার্তার" মধ্যে তাঁর নাম সহ মুক্তিযোদ্ধার নম্বর দেওয়া হয়েছে। তাঁর নম্বর হচ্ছে- ০২০৪০৭০৪৩০। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাবেক এবং বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণদের

আমরা কয়েকবার আবেদন করার পরও তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়নি। এ মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণের পরও যদি একজন স্বার্থক মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক রূপে স্বীকৃতি না লাভ করেন, তা হবে জাতির প্রতি দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

## ৫। বোধিচর্যাবতার ঃ-

কালের বিবর্তনে বৌদ্ধ ধর্ম স্বাভাবিক কারণেই দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বুদ্ধের প্রবর্তিত মৌলিক আদর্শকে যারা প্রকৃত মুক্তির পথ বলে মনে করেছিলেন, সে রক্ষণশীল বৌদ্ধরা থেরবাদী বা হীনযান রূপে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। মহাযানী বৌদ্ধরা পালি ভাষাতে গ্রন্থাদি রচনা না করে সংস্কৃত ভাষাতেই ধর্ম গ্রন্থাদি রচনা করেন। সে কারণে মহাযানী বৌদ্ধ পন্ডিতদের সাধনার ফলশ্রুতিতে অনেক অমূল্য গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। এর মধ্যে 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থটি অন্যতম। পন্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের সংস্কৃত ভাষাতে পারদর্শী ছিলেন। ভারতে শ্রীহর্ষের রাজত্বকালে বৌদ্ধাচার্য শান্তিদেবের সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরই অনুদিত গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী ১৯৭৭ সালে প্রকাশ করে। ডিমাই সাইজের গ্রন্থটি ৫৪ পৃষ্ঠায় সমন্বিত সারগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন **পন্ডিত রাসমোহন চক্রবর্তী**। পরিশিষ্ট ব্যতীত মূল গ্রন্থটি ২২৪ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। এ গ্রন্থে দশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যেমন- ১) বোধিচিন্তানুশংস, ২) পাপ দেশনা, ৩) বোধিচিত্ত পরিগ্রহ, ৪) বোধি চিত্ত প্রমাদ, ৫) সম্প্রজন্য রক্ষণ, ৬) ক্ষান্তি পারমিতা, ৭) বীর্য পারমিতা, ৮) ধ্যান পারমিতা, ৯) প্রজ্ঞা পারমিতা।

এ গ্রন্থটিতে বোধিজ্ঞান লাভ করতে হলে কি কি বিষয়ে চর্যা বা সাধনার অনুশীলন করতে হয়, আচার্য শন্তিদেব তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সাধানার দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করেছেন, পদ্যাকারে সংস্কৃত ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন। আচার্য শান্তিদেবের মতই আরো কয়েকজন মহাযানী বৌদ্ধ পন্ডিত সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এদের মধ্যে কবি অশ্বঘোষ, দিঙ্নাগ, বসুমিত্র, অতীশ দীপঙ্কর, নাগার্জুন ও পন্ডিত শীলভদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের ভূমিকার লেখক **পন্ডিত রাসমোহন চক্রবর্তী** গ্রন্থটিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রারম্ভে আচার্য শান্তিদেবের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। বাস্তব দৃষ্টিতে আচার্য শান্তিদেব যে সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তা

প্রমাণ করতে গিয়ে পরাত্ম সমতা ধ্যান ও পরাত্ম পরিবর্তন ধ্যান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এরপর কিভাবে আপন চিত্তে বোধিচিত্ত উৎপন্ন করতে হয় এরও সুবিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। বোধিসত্ত্বদের জীবন দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তাঁরা যেন সকল প্রাণীর দুঃখ লাঘবের জন্য পাশে দাঁড়াতে পারেন। অধিকন্তু জীবসেবা দ্বারাই বোধিসত্ত্বদের সাধনা পরিপূর্ণতা লাভে সক্ষম হয় বলে এ গ্রন্থে সুবিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এ গ্রন্থের অনুবাদক পন্ডিত **জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর** জীবন সাধনাও যেন বোধিসত্ত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। সে কারণে তিনি এ অমূল্য সারযুক্ত গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষা হতে বঙ্গানুবাদ করে শুধু রচনাই করেননি, বরঞ্চ নিজ জীবনকে বোধিসত্ত্বের আদর্শে প্রভাবিত করারও সাধনা করেছেন। এ মন্তব্যের প্রতিফলন তাঁর সমগ্র জীবনের চিন্তা ও কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। গভীর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা না থাকলে এরূপ একটি গ্রন্থের সানুবাদ কখনো সম্ভব হতনা।

বৌদ্ধধর্ম দর্শন মতে বুদ্ধত্ব লাভেচ্ছুক বোধিসত্ত্বদেরকে অবশ্যই দশম পারমী পরিপূর্ন করতে হয়। কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধ সাধনায় ছয়টি পারমীর কথা উল্লেখ রয়েছে। যথা- ১) দান, ২) শীল, ৩) ক্ষান্তি, ৪) বীর্য, ৫) ধ্যান, ৬) প্রজ্ঞা। অথচ থেরবাদী পালি সাহিত্যে নৈষ্ক্রম্য, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা পারমীর কথা উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে মহাযানী সাধক সম্প্রদায় ছয়টি পারমীতে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য সাধনা করে থাকেন। এ গ্রন্থের অনুবাদক উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত বৌদ্ধ মনীষী পন্ডিত **জ্যোতিঃপাল মহাথের** শুধু মাত্র এ গ্রন্থের অনুবাদ করার মধ্যে তাঁর কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রাখেন। লোক সমাজের হিত সাধনায় তাঁর অর্জিত সমস্ত ধন সম্পদ ও জ্ঞান বুদ্ধি দান করে নিজ জীবনকে ধন্য করেছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৪ সালে এ গ্রন্থটির প্রথম হতে অষ্টম পরিচ্ছদ পর্যন্ত **গোপাল দাস চৌধুরী** বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। দীর্ঘ বছর পর সম্পূর্ন গ্রন্থটি ১৯৭৭ সালে **পন্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের** অনুবাদ করলে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। অনুবাদের মধ্যে মহাথেরোর বৈশিষ্ট্য ও পাণ্ডিত্য ফুটে উঠেছে। অনুবাদের মাপকাঠিতে মহাথেরোর অনুবাদটিই উপাদেয় হয়েছে বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়। অনুবাদের নিরিখে নিরীক্ষণ করার জন্য দুজন অনুবাদকের অনুবাদ নিম্নে উদ্বৃত করলাম-

**"সুগতান্ সসুতান সদ্ধর্ম্মকায়ান**
**প্রণিপত্যাদরতোঽখিলাংচ বন্দ্যান্**
**সুগতাত্মজ সংবরাবতারং**
**কথয়িষ্যামি যথাগমং সমাসাৎ"**

শ্রী গোপাল দাশ চৌধুরীর অনুবাদ ঃ- বুদ্ধগণ, বুদ্ধসুত বা বোধিসত্ত্বগণ, ধর্মস্কন্ধ সকল এবং অখিল বন্দ্যগণ, ইঁহাদের সকলকে আদরপূর্বক প্রণিপাত করিয়া বোধিসত্ত্বগণের যে সংবর, তাহার অবতারের বা মার্গের বিষয় যথাশাস্ত্র সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর অনুবাদ ঃ- সুগতগণ ও তাঁহাদের পুত্র বোধিসত্ত্বগণ, তাঁহাদের ধর্ম কার্যের সহিত সকল বন্দ্যনীয় ব্যক্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সুগতাত্মজ বোধিসত্ত্বগণের সাধন মার্গ শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

অনুবাদ সহজ নয়। এ দুইজনের অনুবাদের মধ্যে সহজ, সরল, সাবলীল ও বোধগম্যতার মধ্যে মহাথেরোর অনুবাদটি সুখপাঠ্যরূপে বিবেচিত। এতে সংস্কৃত ভাষায় মহাথেরোর জ্ঞান গভীরতা সহজেই অনুমান করা যায়।

## ৬। বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ সম্মেলন ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ ঃ-

দেশ-বিদেশ ভ্রমণ শিক্ষা জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে বিবেচিত। পড়ার দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা এর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। এজন্য যুগ যুগ ধরে পর্যটকেরা স্বচক্ষে দেশ-বিদেশ প্রত্যক্ষ করার জন্য ভ্রমণ করে থাকেন। পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোও ও বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সম্মেলনে যোগদান করার উদ্দেশ্য ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়া গমণ করেন। সে সময় সম্মেলনের কাজ ছাড়াও, তিনি মালয়েশিয়ায় যেসব মনোমুগ্ধকর স্থান পরিদর্শন করেন এরই একটি মনোজ্ঞ প্রতিচ্ছবি এ পুস্তকে তুলে ধরেছেন।

লেখকের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে-"বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ সম্মেলনে ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ" পুস্তকটি উচ্চাঙ্গের ভ্রমণ কাহিনী রূপে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। এ পুস্তকটি ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি পূজনীয়

বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির ও মহাসচিব মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়ার সাথে বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। সে বছর ১২ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল মোট ১৮ দিনের মালয়েশিয়া ভ্রমণের চমকপ্রদ ভ্রমণ কাহিনী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর প্রথম বিদেশ ভ্রমণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা ও উপভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখনির মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। ১৭৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত তাঁর লিখিত ভ্রমণ কাহিনীটি রসালো ও সু-সমৃদ্ধ হয়েছে।

লেখক মালয়েশিয়ার প্রতিটি রাস্তা-ঘাট, ভবন উদ্যানের সৌন্দর্য সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। যে কারণে প্রতিটি অধ্যায় সহজে পাঠকের মনে রস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। পাঠকদের মনে জানার আগ্রহ জন্মাবার উদ্দেশ্যে লেখক লেখার মধ্যে রস সঞ্চার করেছেন। লেখক মালয়েশিয়ার ভৌগলিক অবস্থান সহ রাজনৈতিক অবস্থাদি সাধারন মানুষের আচার ব্যবহারের কথা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে কোথায়, কি কারণে দেশ-বিদেশের মানুষের সাথে কি কথা বললেন, সে সব কথা রসালো ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। লেখক কুয়ালালামপুরের বিখ্যাত বুদ্ধ মন্দির, মসজিদ, হিন্দু মন্দির সহ পিনাঙ্গের সর্প মন্দির, বাদুর মন্দিরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

লেখক তার ভ্রমণ কাহিনীতে মাঝে মাঝে রসালো ভাব ভাষা প্রয়োগ করে পাঠকের জানার উদগ্র আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। প্রয়োজনে হিন্দি ভাষীদের সাথে হিন্দি ভাষায় কথা বলেছেন। একদিন মালয়েশিয়া পিনাঙ্গ যাওয়ার পথে তক্-কোক বিহারের ফটো তোলা হচ্ছিল। প্রতিটি ফটোর দাম তিন ডলার। তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ানো ছিল-লোব-সঙ্গ-তানজিন' নামক হিন্দী ভাষাভাষী একজন ভদ্রলোক। তিনি মহাথেরোর হাব-ভাব বুঝে জিজ্ঞাসা করলেন-"দেখিয়ে জী! আপ ফটোলিয়া? মহাথেরো প্রত্যুত্তরে বললেন-'হ্যাঁ জী লিয়া? কিতনা দাম? তিন ডলার। ভদ্রলোক পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন- 'আপ লিয়া? মহাথেরো বললেন- কহা জী, মেরী পাস-পৈসা তো নেহী হ্যায়, লেকিন তো জরুরৎয়া।" তখন ভদ্রলোক মানিব্যাগ হতে ডলার বের করে বললেন-'লি জিয়ো তিন ডলার। ইসকো ফটো লি জিয়ো। তিন ডলা আপকো দান করতা হু। তখন মহাথেরো বললেন-আপকে ধন্যবাদ। আপকা পাশ শুক্র গুজার রহুঁ"।

মালয়েশিয়া ভ্রমণ শেষে পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের ২৬ এপ্রিল মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন পথে থাইল্যান্ডে যাত্রা বিরতি করেন। **মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথের** ও **মিঃ দেবপ্রিয় বড়ুয়া** বিমান বন্দর হতে থাইল্যান্ডের বিখ্যাত মার্বেল বিহারে গমন করেন। সে বিহারে অনেক ভিক্ষু-শ্রামণ বাস করে। তাই প্রতিটি কাজের জন্য মাইক ব্যবহার করা হত। সে সময় মহাথের থাইল্যান্ডের কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দর্শন করেন। এর মধ্যে যে স্থানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ছিল, সে **নগর পত্তনের** বিবরন দিতে গিয়ে মহাথের বলেছেন-

"ব্যাংকক মহানগরী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৭৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচার কল্পে যে ভিক্ষু সঙ্ঘ সুবর্ণ ভূমিতে পাঠিয়েছিলেন সে সঙ্ঘের নায়ক ছিলেন সোম ও উত্তর নামক দুজন প্রাজ্ঞ স্থবির। .....সোম উত্তর স্থবিরগণ শ্যামদেশের যে স্থানে বা নগরে উপবিষ্ট হয়ে তথাকার জনগণকে সর্বপ্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন তার নাম **নগরপত্তন**। সে স্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মায়ানমারের সোয়েডাং প্যাগোডার মতো বিরাটাকায় প্যাগোডা নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কারুকার্য দিক বিচার করলে সোয়েডাং প্যাগোডাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। মহাথের তাঁর জীবনে আরো অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। যদি তিনি সব ভ্রমণ কাহিনী লিখে যেতেন তাহলে পাঠকগণ ঘরে বসেই অজানাকে জানার সুযোগ লাভ করত।

## ৭। ব্রহ্ম বিহার ঃ-

পূজনীয় **জ্যোতিঃপাল মহাথের** অধ্যাত্ম জীবনের ফসল রূপে প্রকাশিত হয়েছে, ব্রহ্ম বিহার নামক পুস্তকটি। এ পুস্তকে বর্ণিত বিষয় বস্তুর মধ্যে লেখকের উচ্চাঙ্গের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে ৩১ প্রকার লোক ভূমির মধ্যে ষোল প্রকার রূপ ব্রহ্মভূমির কথা ত্রিপিটকে উল্লেখ আছে। রূপ ভূমির ব্রহ্মরা সর্বদা জীব জগতের প্রতি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাব পোষণ করে থাকেন। ভগবান দুর্লভ মনুষ্য জন্মলাভী মানুষদেরকে সর্বক্ষণ ব্রহ্মদের মত সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। যাঁরা প্রতিনিয়ত এরূপ ভাবনায় নিজকে নিয়োজিত রাখেন, তাঁরা ব্রহ্ম বিহার সাধনার দ্বারা সকল তৃষ্ণা নিঃশেষ করে, অন্তিমে নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন।

পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত এ পুস্তকটিতে সুবিস্তৃত ভাবে মৈত্রী করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। মহামান্য ৮ম সংঘরাজ **শীলালংকার মহাথের** এ গ্রন্থের একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখে পুস্তকটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। ভূমিকাতে ১০ম সংঘরাজ মাতা-পিতাও ব্রহ্ম সাদৃশ্য বলে দেখাতে গিয়ে লিখেছেন-

**"ব্রহ্মাতি মাতা-পিতারো পুব্বাচরিয়াতি বুচ্চরে"**

অর্থাৎ পৃথিবীতে আদি গুরু হচ্ছে মাতা-পিতা। সেজন্য তারা ব্রহ্ম সদৃশ্য। মাতা-পিতা সন্তানদের প্রতি সর্বদা মৈত্রী, করুনা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাব পোষণ করে থাকেন। ১৯৭৯ সালে পালি বুক সোসাইটি পুস্তকটি প্রকাশ করেন। প্রকাশক পরিচিতি পর্বে জাপানের স্বনামধন্য **ধর্মগুরু রিশোকোশাই কাইর** পরিচিতি তুলে ধরেছেন। পুস্তকটিতে চীনের কংসু প্রদেশের **কাহচিশানের** ১৩৫নং গুহায় প্রাপ্ত (৩৮৫-৫৩৪খ্রিঃ) বুদ্ধ মূর্তির প্রতিচ্ছবিটি ছাপাতে পুস্তকটির গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ পুস্তকের লেখক সর্বদা মৈত্রী ভাবাপন্ন ছিলেন। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনেক দুর্মতি পাপ-পরায়ণ তাঁকে নানাভাবে ঘাত-প্রতিঘাত দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু আমি দেখিছি তিনি মৈত্রী পূর্ণা চিত্তে শত্রুকে শত্রু না ভেবে, তার প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করেছেন। কোন দিন প্রতিবাদও করেননি, নীরবে সহ্য করেছেন। বরঞ্চ তিনি বলতেন, শত্রুর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করলে নিজেই উপকৃত হয়। তিনি ব্রহ্ম বিহার পুস্তকে লিখেছেন-

"যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ করে, সে তাতে অধিকতর পরাজিত হয়, আর ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ বা বিদ্বেষ না করে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করেন, তিনি আত্মপর উভয়েরই হিত সাধনা করেন। শত্রু যদি আপণ হৃদয় কলুষিত করে আমাকে আক্রোশ করে, তবে আমিও কি আমার অন্তঃকরণ বিক্ষুদ্ধ করে শত্রুর প্রতি আক্রোশ করব? যদি তাই হয়, তবে আমি নিজেই নিজের নৈতিক অধঃপতন ডেকে আনব। শত্রু ক্রোধান্ধ হয়ে অহিত মার্গ অনুসরণ করবে বলে আমি কেন তা করতে যাব? বহু উপকারী মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ত্যাগ করে দুর্লভ মানব জীবন লাভ করেছি, এখন কোন মহাশত্রু তুল্য বিদ্বেষ পোষণ ত্যাগ করতে পারবনা? বর্তমান বিদ্বেষ পূর্ণ জগতে অবিদ্বেষ ভাব নিয়ে মনুষ্য জন্মের স্বার্থকতা আনতে হলে এ পুস্তকটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মহাথের তাঁর অন্তর হতে উৎসারিত অব্যক্ত ব্রহ্ম বিহার সাধনায় মনোনিবেশ করে আত্ম

ও পরহিত সাধনায় এগিয়ে আসতে মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ পুস্তকের ভাব, ভাষা, রচনা শৈলী ও উপস্থাপণায় কোন ছেদ পড়েনি বলে সুখপাঠ্য হয়েছে বলে বলা যায়।

## ৮। ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান পতন ঃ-

স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঁধা ধরা রুটিন মাফিক লেখাপড়া না করেও পৃথিবীতে যে কয়েকজন ক্ষণজন্মা মনীষী বিশ্ব সাহিত্য ভান্ডারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অমর হয়ে রয়েছেন, এঁদের মধ্যে ভারতের বিশ্ববিশ্রুত পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন অন্যতম। তিনি ১৮৯৩ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, উপন্যাস বিষয়ে ১৫০টি গ্রন্থ উপহার দিয়ে যান। এ অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন "ভারত মে বৌদ্ধ ধরম্‌ক উত্থান ঔর পতন" পুস্তিকাটি পন্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে অসাধারণ পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা এক দুরূহ ব্যাপার। এজন্য অনুবাদকের যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা হচ্ছে উভয় ভাষার প্রতি সমদক্ষতা। সর্বোপরি যে ভাষা হতে আপন মাতৃভাষায় অনুবাদ করা, সে ভাষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের প্রয়োজন সমধিক। তা না হলে আদর্শ অনুবাদ না হয়ে ভাবানুবাদ হবে। অনুবাদক পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের চল্লিশ দশকে কলকাতা ধর্মাঙ্কুর বিহারে অধ্যয়নকালে রাহুল সাংকৃত্যায়নের লিখিত পুস্তকটি সংগ্রহ করেন। যে ভারতে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যূদয় হয়েছিল, অথচ কালের প্রভাবে সে ভারতেই বৌদ্ধ জাতির পতন ঘটেছে। এর কারণ কি, রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতন পুস্তিকাতে এর বাস্ত ব রূপ তুলে ধরেছেন।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ হতে চ্যুত হয়ে বৌদ্ধরা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এজন্য বৌদ্ধদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। বিশেষত অষ্টম শতাব্দী হতে তন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ হতে চ্যুত হয়ে অনেক পশ্চাতে চলে যায়। এর ফলে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজ রাজশক্তিও হারিয়ে ফেলে। বৌদ্ধদের এরূপ দুর্বলতার সুযোগে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আক্রমনে বৌদ্ধরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকে মৃত্যু বরণ করে। এভাবে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতন হয়।

এ পুস্তিকাটির প্রাক-কথনে লেখক ভারতে প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী গ্রীকরা কিভাবে বৌদ্ধ ধর্মের অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং বৌদ্ধ শিল্পকলা ভাস্কর্যে উৎকর্ষতা সাধন করেছেন এর সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-

"কালের বিবর্তনে জগতের সবকিছু গতিশীল, পরিবর্তনশীল, উত্থান ও পতনশীল, অনিত্যতা জগতের স্বাভাবিক ও অকাট্য বিধান। অনিত্যতার গর্ভে জগতের সব কিছুকেই একদিন বিলীন হতে হয়। এক সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম সগৌরবে প্রচার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রায় দু'হাজার বছর যাবৎ ছিল এর প্রবল প্রভাব প্রতিপত্তি। এরপর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম স্তিমিত হল বটে, কিন্তু বহির্ভারতের সর্বত্র এ ধর্মের ব্যাপক অভ্যুদয় ঘটল।"

অনুবাদক পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের এ পুস্তিকায় কিভাবে বর্ণ-বৈষম্য ভাব দ্বারা মানুষ পরোক্ষভাবে কিভাবে নিজের মনকে কলুষিত করে এর আভাস দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-

"বর্ণ গোত্র ও সম্প্রদায় বহুল দেশে একে অন্যের প্রতি কত রকমের শব্দ যে হেয় [illegible]ন ব্যবহার করে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। পন্ডিতকে গালিচ্ছলে অজ্ঞ শ[illegible] ব্যবহার করলে, কিংবা অজ্ঞকে ব্যঙ্গ করে পন্ডিত বললে মনোক্ষুন্নতার সৃষ্টি করা যায় বটে, কিন্তু মৌলিক স্বাভাবিক শব্দের অর্থ বৈকল্য ঘটান যায় না, এতে আপন কলুষিত মনোভাবেরই পরিচয় হয় এবং সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বিষ ছড়ান হয় মাত্র। বৌদ্ধ বিনয় বিধানে আছে কোন মানুষের প্রতি বর্ণ, গোত্র সম্প্রদায় বা জাত ধরে সাধারণ কথা বলাও অপরাধ। যেহেতু এক্ষেত্রে মানবতা বিরোধি ভেদ বুদ্ধির আভাস আছে।"

মহাথের স্বীয় প্রতিভা ও মেধা দ্বারা হিন্দি ভাষা হতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে অজানাকে জানার জন্য এ পুস্তকটি মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন। সর্বোপরি এ পুস্তকটি অনুবাদের দ্বারা তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ও পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

## ৯। প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ ঃ-

বিশাল ত্রিপিটক গ্রন্থ সূত্র বিনয় অভিধর্ম হিসাবে তিনভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে ৪২ হাজার ধর্মস্কন্ধ সমন্বিত অভিধর্ম পিটক। সমগ্র অভিধর্ম পিটকে মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ বিদ্যমান। চিত্ত, চৈতকি, রূপ এবং নির্বাণের স্বরূপ এ অভিধর্ম পিটকে বর্ণিত হয়েছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ শ্রীলংকায় গিয়ে পালি শাস্ত্র

অধ্যয়ন পূর্বক ত্রিপিটকের টীকা লিখেন। এসব টীকা গ্রন্থের মধ্যে "বিশুদ্ধি মার্গ" গ্রন্থটি অতি বিশাল ও পান্ডিত্যপূর্ণ। পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে এম.এ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যোপোযোগী হিসেবে এ গ্রন্থটি লিখেন ১৯৮১ সালে। মূলতঃ বিশুদ্ধি মার্গের সপ্তদশ অধ্যায়ই প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ নামে পরিচিত। মূল গ্রন্থটি ৯৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। অবসর প্রাপ্ত সরকারী সার্জন **ডাঃ শুভঙ্কর বড়ুয়া** এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে সমাজের মহদুপকার সাধন করেছেন। প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থটিতে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির ব্যাখ্যা রয়েছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ প্রণীত সমুৎপাদ নীতির গভীরতা উপলব্ধি করে বলেছেন,

**"বত্তুকামো অহং অজ্জ পচ্চয়াকার বন্ননং,**
**পতিনাধিগচ্ছামি অজ্ঝোগাহেলাব সাগরং"**

অর্থাৎ আমি প্রত্যয়াকার রূপে প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি বর্ণনা করতে চাই, কিন্তু মহাসমুদ্রে পতিত ব্যক্তির ন্যায় কোন ঠাঁই পাচ্ছিনা।

অথচ এ গ্রন্থের অনুবাদক পূজনীয় শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের এমন একটি জটিল দুরূহ বিষয়টিকে প্রাঞ্জল সাবলীল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। তিনি সাধারণ পাঠকদের সামনে সহজে বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রচ্ছদে উদীচ্য বৌদ্ধদের ব্যবহৃত ভবচক্রের বারটি প্রতীক ব্যবহার করে গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। এ চক্রের বৃত্তের মাঝে কপোতরূপী লোভ, সর্পরূপী দ্বেষ এবং শূকর রূপী মোহ দ্বারাই এ ভবচক্র সর্বদা ঘূর্ণায়মান। তৃষ্ণার কারণ জন্ম এবং অবিদ্যাই তৃষ্ণার উৎপত্তির প্রধান উৎস। অনুবাদক মহাথের এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ন অভিধর্ম পিটকের একটি পরিচ্ছদ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে, অভিধর্ম পিটকের প্রতি যে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও জ্ঞান রয়েছে, এরই প্রমাণ করেছেন।

## ১০। সাধনার অন্তরায় ঃ-

সাধনহীন জীবন লাভ নিরর্থক। সাধনা ব্যতীত ভব মুক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়না। জ্ঞান উৎপন্ন না হলে জীবনে মুক্তি আসেনা। এ কারণে সাধকগণ ভবরোগের মুক্তির জন্য সংসারে যাবতীয় ভোগ বাসনার নাগপাশ ছিন্ন করে জীবন সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাধন পথে কি কি অন্তরায়ের সম্মুখীন

হতে হয়, লেখক তাঁর সাধন লব্দ জ্ঞানের আলোকেই এ পুস্তকটি লিখেছেন। বিশেষ করে লেখক নিজেই কিভাবে সাধনা করতে হয় এর অনুশীলন করেছেন। তিনি শুধু দেশে নয়, বুদ্ধগয়া ও মায়ানমার গিয়ে সদগুরুর সান্নিধ্যে বিদর্শন সাধনা করেছেন। তিনি অনেক সময় বরইগাঁও কনকচৈত্য বিহারে মৌন ধ্যানে কালাতিপাত করতেন। কিভাবে বিদর্শন ভাবনা করতে হয় প্রায় সময় দেশনা করতেন। পদ্মাসন সহ বিভিন্ন আসনের অনুশীলন করতেন। তিনি মাঝে মাঝে অনাথ আশ্রমের ছাত্রদের নিকট এসব বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতে দেখেছি। তাই তাঁর অনুশীলিত সাধনার অনুভূতির কথাই এ পুস্তিকাতে প্রাধান্য লাভ করেছে।

লেখক নিজেও একজন সাধক ছিলেন যুগপৎ সাধনার পথে অগ্রসর হতে শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁর কিভাবে সাধনার প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল, এ পুস্তিকার উৎসর্গ পর্বে এর আভাস রয়েছে। তিনি এ পুস্তিকাটি আর্য শ্রাবক ভাবনাচার্য-**শ্রী রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দির** পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে গিয়ে বলেছেন,-১৯৩৮ সালের জুলাই মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার,সকাল জোবরা সুগত বিহারের বদ্ধসীমায় ভিক্ষু জন্মের পরক্ষণেই যিনি জোবরা থেকে আমাকে গুমানমর্দনের অথৈ সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় বিহারে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যাকে আমার কোসা নৌকার মাঝিরূপে সর্বক্ষণ পেয়েছিলাম। আমি তখন জানতাম না যে,আমার মাঝি অকূল ভব-সমুদ্রে পারাপারের একজন সুযোগ্য মাঝি।যাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে বর্ষাবাসের তিনমাস অতিবাহিত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।যাঁর হাতে আমার জীবনের সাধন ভজনের ভিত গড়ে উঠেছিল।

তাঁর এই স্বীকারোক্তি দ্বারা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে,যৌবনের উষালগ্নেই তাঁর অন্তরে সাধনার বীজ বপিত হয়েছিল।সে বীজ পরবর্তীকালে বিশাল মহীরূপে উন্নীত হয়ে পত্র পুষ্প-সুশোভিত হয়েছে।

লেখক তাঁর ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে অতি সুনিপুণভাবে সাধনার পথে যে পাঁচটি অন্তরায় রয়েছে,সেগুলোর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।সে পাঁচটি অন্তরায় হল-১) কর্মান্তরায়, ২) ক্লেশান্তরায়, ৩) বিপাকান্তরায়, ৪) উপবাদান্ত রায় এবং ৫) আজ্ঞা-অমান্যান্তরায়।

*** কর্মান্তরায়ঃ-**

কর্মান্তরায় এর মধ্যে পিতৃহত্যা,মাতৃহত্যা,অর্হৎ হত্যা, দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাত,লোভ দ্বেষ এবং মোহের বশীভূত হয়ে সংঘভেদ দ্বারা মানুষ যে নারকীয় দুঃখ ভোগ করে এর সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

*** ক্লেশান্তরায়ঃ-**

ক্লেশান্তরায়ের মধ্যে অহেতুক দৃষ্টি,অক্রিয়া দৃষ্টি ও নাস্তিক দৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে দশটি। সে দৃষ্টি হল লোভ ,দ্বেষ,মোহ,মান,দৃষ্টি,সন্দেহ,আলস্য অবসাদ,ঔদ্ধত্য ও কৌকৃত্য। লেখক প্রতিটি বিষয়ের গূঢ়ার্থ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করে পাঠকের নিকট সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। নিজে উপলব্দি না করলে এত সহজভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পাঠকের সামনে পরিবেশন করা সম্ভব ছিলনা।

*** বিপাকান্তরায়ঃ-**

বিপাকান্তরায়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন মানুষ আপন কুশল বা অকুশল কর্ম সম্পাদনের দ্বারা জীবকুলে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনটি অন্তরায়ের কারণে জন্ম দুঃখের কারণ হয়। সে তিনটি হল-ক)অহেতুক জন্ম (অকুশল অহেতুক ও কুশল অহেতুক),খ) দ্বিহেতুক জন্ম (অলোভ-অদ্বেষ) এবং গ) ত্রিহেতুক জন্ম (অলোভ,অদ্বেষ,অমোহ)।অহেতুক জন্ম -পশু,পাখী,কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি ত্রিবর্গ প্রাণীগণ অকুশল অহেতুক জন্মের অন্তর্গত।দ্বিহেতুক জন্ম-জন্ম বধির, খঞ্জ, অন্ধ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ মনুষ্যগণ এবং ভূম্যাশ্রিত নিম্নশ্রেনীর অসুরাদি কুশল অহেতুক জন্মাধীন। ত্রিহেতুক জন্ম পরিপূর্ণ সম্পন্ন মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করলেও শক্তিশালী সংস্কারের অভাবে দ্বিহেতুক সত্ত্বরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ফলে তাদের বুদ্ধি, বিবেচনা স্মৃতি শক্তি ও জ্ঞান দুর্বল হেতু কস্মিনকালেও নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারেনা।

*** উপবাদন্তরায়ঃ-**

যারা আর্য পুরুষদের প্রতি গালি,ঠাট্টা,অবজ্ঞা,বিদ্রূপ এবং সর্বদা অবমাননা সূচক বাক্য প্রয়োগ করে পাপার্জন করে,সেসব মূর্খ ব্যক্তি কখনো মার্গফল লাভ করতে পারেনা।এমন কি সপ্তকাম সুগতি ভূমিতেও জন্ম গ্রহণ করতে সক্ষম হয়না। তারা অপায় ভূমিতে জন্ম নিয়ে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে থাকে।এ অন্তরায় হতে মুক্তির উপায় হচ্ছে,যাঁর প্রতি অবজ্ঞা করা হয়, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ক্ষমা প্রাপ্তিতে এহেন অন্তরায় হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

*** আজ্ঞা-আমান্যান্তরায়ঃ-**

ভিক্ষুদের পরিশুদ্ধির জন্য বিনয় হচ্ছে প্রাণ। কিন্তু কোন শ্রামণ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী যদি বিনয়ের কোন নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করে,এতেও তাদের সাধনার পথে অন্তরায় ঘটে।এছাড়াও যে ভিক্ষু শ্রামণ পঞ্চনীবরন যথা-কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য ও বিচিকিৎসায় জড়িয়ে পড়ে,তাঁরাও কখনো সাধনায় সফল কাম হতে পারেনা।এ গ্রন্থের লেখক পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের নিজে একজন সুবিজ্ঞ পন্ডিত ও সাধন জগতে বিচরণশীল সাধক ছিলেন। তাই তিনি সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।এ গ্রন্থটি প্রতিটি সাধকের জন্য পঠনীয়,পালনীয় ও অনুসরণীয় বলে আমি মনে করি।

## ১১। উপসংঘরাজ গুণালংকার মহাস্থবিরঃ-

বিংশ শতাব্দির প্রথম লগ্নে বাংলাদেশের পতনোন্মুখ বৌদ্ধ সমাজে যে কয়েক জন সংঘ মনীষা আপণ ত্যাগ তিতিক্ষা,মেধাশক্তি ও শ্রম দিয়ে বৌদ্ধ সমাজকে জাগিয়ে তুলেছেন,এঁদের মধ্যে উপসংঘরাজ পূজনীয় গুণালংকার মহাস্থবিরের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের তাঁর গুরুদেবের অমর জীবনালেখ্য স্বল্প পরিসরে উপস্থাপণ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসংঙ্গত উপসংরাজের সহপাঠি কুমিল্লা জেলার আলীশ্বর গ্রামের কৃতি পুরুষ পূজনীয় অগ্রমংগল ও পূজনীয় গুণালংকার মহাস্থবির শ্রীলংকায় লেখাপড়া করার জন্য বর্তমানে মায়ানমারের রাজধানী রেংগুনে গমন করেন। দুভার্গ্য অগ্রমংগল রোগাক্রান্ত হয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভর্তি হন। তখন মৃত্যুর শয্যাপাশে উপবিষ্ট বন্ধুবর পূজনীয় গুণালংকার মহাথেরকে বললেন-বন্ধু গুণালংকার আমার জীবন প্রদীপতো এখানেই শেষ।জন্মভূমি দর্শন আমার ভাগ্যে আর ধরলনা। আমার জন্মভূমি লাকসাম-কুমিল্লা,ধর্ম-কর্ম শিক্ষা-দীক্ষায় বড় অনুন্নত। ধর্ম সংস্কৃতি মৌলিক আদর্শ বলতে তাদের কিছু নেই। আমার অনুরোধ,তুমি দেশে গিয়ে আমার জন্মভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তখন পূজনীয় মহাথের বলেছিলেন- "যাও বন্ধু,নিশ্চিত মনে যাও,তোমার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হউক।আমি যদি জীবনে বেঁচে থাকি,আমি তোমার জন্মভূমিকে দেখব।তোমার অনুরোধ পালন করব"।পূজনীয় গুণালংকার মহাথের তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

লেখক পূজনীয় জ্যোতিঃপাল-মহাথের অতীতকালে কুমিল্লা বৌদ্ধ সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও শ্রামণ্য সংস্কৃতির দুইটি ধারা কিভাবে বৌদ্ধ সমাজকে প্রভাবান্বিত করেছিল তা তুলে ধরেছেন।সংস্কৃতি বলতে যা বুঝাতে চেয়েছেন নিম্নে তা উল্লেখ করলাম।

"সমাজ বিবর্তন এবং দেশ কাল জাতি ভেদে পূর্বোক্ত নিয়মে সংস্কৃতির ধারা বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করলেও বর্তমান যুগে ধর্ম সংস্কৃতির প্রভাব বা অবদান মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে।দেশ ভিত্তিক জাতীয় ও মানবিক সংস্কৃতির প্রকৃত কল্যাণ আদর্শ এড়িয়ে গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার নিরর্থক আস্ফালন দ্বারা বিভেদাত্মক সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প বিস্তারিত হয়।ফলে দেশে সমাজে নিত্য দুর্নীতি, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, দুর্বলের উপর অত্যাচার, হানাহানি ও রণদুর্মদ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে থাকে। যেহেতু সংস্কৃতির মূলাদর্শ গত অর্থ কর্ষণ, উৎকর্ষ, চিত্তোৎকর্ষের অভিব্যক্তিই হল সংস্কৃতি। অতএব কালের প্রেক্ষাপটে পূর্ব কথিত ধারায় একটা দেশ বা জাতির সমগ্র জীবন পদ্ধতি,চিন্তাধারা ও মননশীলতার বহিপ্রকাশ হল সংস্কৃতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একটা শিশু সন্তানের চেহারা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-ব্যবহার ও হাবভাবে, মাতৃ-পিতৃ সংস্কার ও পরিবেশ প্রভাবিত আচরণ পুরোপুরি লক্ষ্য করা যায়। এভাবে সংস্কৃতির মুকুরে ধরা পরে একটা জাতির মানস-প্রবণতা, আনুষ্ঠানিক সামাজিকতা, শিল্প সাহিত্যের কারুকৃতি, ধর্মের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শন। সবশেষে বলা যায় সংস্কৃতি হচ্ছে একটা জাতির প্রাণ সত্তার কর্মময় চিন্তার অভিব্যঞ্জনা। বহু কালের জাতীয় জীবনের মর্মধ্বনি বেজে ওঠে সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক বীণাযন্ত্রে। সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য কল্যাণময়তা। মানুষের জীবনে বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্যই সংস্কৃতি পুনরুদ্ভাবিত হয় ও যুগোপযোগী রূপান্তর গ্রহণ করে। তদ্ধেতু জাতির শিল্পে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে, ধর্মে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, আচার-ব্যবহারে ও শিক্ষার-সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। ইহাই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য"।

এ পুস্তকটিতে লেখক কুমিল্লা জেলার তৎকালীন সামাজিক ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থাদির একটা সবাক চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এ জেলার বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ কিভাবে আসতে পারে এরও একটা রূপরেখা অংকন করেছেন। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই লেখক এ পুস্তকটি লিখতে সক্ষম হয়েছেন। পুস্তকটি ১৯৮৫ সালে পালি বুক সোসাইটি প্রকাশ করে।

৩৮পৃষ্ঠা সমন্বিত এ পুস্তকটিতে যেসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে,সেজন্য এটি পাঠকদের অন্তরে সহজেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। উপসংঘরাজ পূজনীয় গুণালংকার মহাস্থবির যে একজন সুবিজ্ঞ লেখক ও কবি ছিলেন তাঁর লিখিত একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন-

**"উত্তরে মিঠাছড়া মিষ্ট জলবাহিনী**
**দক্ষিণে ফতেপুর বীর প্রসবিনী।**
**পূর্বে রাজপথে কলকল,**
**পশ্চিমে পর্বতমালা অচল অটল।"**

## ১২। চর্যাপদঃ-

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্য ভান্ডারের উজ্জ্বল রত্ন ভান্ডার। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদ নামটি সকলের নিকট সুবিদিত।৮ম হতে ১২তম শতাব্দিতে সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকেরা তাঁদের সাধনলব্দ অনুভূতির কথা হেঁয়ালি ভঙ্গিমায় এবং আলো-আঁধারী ভাষায় রচনা করেন।প্রকৃতপক্ষে সব চর্যাতেই বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের আভাস রয়েছে। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল গ্রন্থাকার হতে এ গ্রন্থের পান্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পরবর্তী সময়ে **ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, ডঃ শশী ভূষণ দাশগুপ্ত** পন্ডিত **রাহুল সাংকৃত্যায়ন** নেপাল গ্রন্থাগার হতে অনেকগুলো চর্যা সংগ্রহ করেন। পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের জীবনীও সংগ্রহ করেন। বর্তমানে বাংলা অনার্স শ্রেণীতে চর্যাপদ পাঠ্য রূপে পড়ানো হচ্ছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক সাহিত্যিক চর্যাপদের সংস্করণ লিখিছেন এবং প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক লেখাই নিজ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চর্যাগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে এ চর্যাপদের লেখকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি বৌদ্ধ দর্শনের সাথে চর্যাপদের মিল খোঁজে পেয়েছেন। তাই লেখক পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের চর্যাপদে কিভাবে মূল বৌদ্ধ দর্শনের ধারা প্রবেশ করেছে,তা পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত পক্ষে চর্যাপদের মূল রহস্য সমন্ধে জানতে হলে বৌদ্ধ ধর্মের দুইটি ধারা হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। নশ্চেৎ চর্যাপদের গুঢ়ার্থ উদ্‌ঘাটন করা এবং রস আস্বাদন করা কারোর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই লেখক এ গ্রন্থের মন্তব্যে যে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন তা প্রণিধাণযোগ্য। মূলত বৌদ্ধধর্মের আদর্শ

দ্বিবিধ, তাতে বৈপরীত্য কিছু নেই। মুক্তির তারতম্য আছে মাত্র। একটি হীন, ক্ষীন সংক্ষিপ্ত। অপরটি বিস্তীর্ণ মহৎ মহান,----------থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ হল বুদ্ধ আর মহাযান বৌদ্ধধর্মের আদর্শ হল বোধিসত্ত্ব বা ভাবা বুদ্ধ। থেরবাদীদের আদর্শ হল বুদ্ধের নীতি আদর্শের অনুশীলন করে অতি সহজে জীবন প্রপঞ্চ ধ্বংস করে জীবনের দুঃখের অবসান ঘটানো। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি আশা না করে অর্থাৎ লাভ পূর্বক নির্বাণ সাক্ষাৎ করা। কিন্তু মহাযানীদের উদ্দেশ্য হল বোধিসত্ত্ব জীবন যাপন করে জীব জগতের মহৎ উপকার সাধন করে অন্তিমে বুদ্ধত্ব লাভ করে নিজ জীবন ধন্য করা।

চর্যাকারদের জন্মস্থান নির্ধারন করতে গিয়ে লেখক পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতানুসারে কয়েকজন চর্যাকারের জন্মস্থানের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সিদ্ধাচার্য ও প্রথম চর্যাকার ছিলেন মীননাথ বাঙ্গালী। সর্বাধিক সংখ্যক চর্যাকার কান্থুপাদের বাড়ী উড়িষ্যা হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনের বেশীরভাগ অতিবাহিত হয়েছে নওগাঁও জেলার সোমপুরী বিহারে। জালন্ধরীপাদের জন্মস্থান ছিল বাড়বকুন্ডে। বিরূপাপাদ, ডোম্বীপাদ, কুমিল্লা। চাটিলপাদ, তিলোপাদ, নারোপাদ, চট্রগ্রাম। গোরক্ষপাদ, চৌরঙ্গীনাথ, সকলে ছিলেন জালন্ধরীপাদ বা হাড়িপা সিদ্ধার শিষ্য। পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের তাঁর ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত পুস্তকটিতে মোট ৫০টি চর্যার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি চর্যা আক্ষরিক অনুবাদ পাঠান্তর ব্যতীতও যুক্তিপূর্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে চর্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী চর্যাপদ লেখকদের অনেক মত খন্ডন করেছেন।কান্থুপাদের ১০ নং চর্যাটির আলোচনা প্রনিধানযোগ্য।

**"এক সো পদমা চৌষট্‌ঠী পাখুড়ী**
**তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বি বাপুড়ী।"**

এক সেই পদ্ম।পদ্মটি চৌষট্রি পাঁপড়ি যুক্ত। তার উপর আরোহন করে ডোমনী বেচারী নৃত্য করছে। অনান্য চর্যাকারেরা হিন্দু যোগ তন্ত্রের চৌষট্রি দলযুক্ত ষট্ চক্রের মধ্যে নির্বাণ চক্র। মহাথের ৬৪ চক্র বলতে, (৪) স্মৃত্যুপ্রস্থান, (৮) অষ্টাঙ্গিক মার্গ, (১২) দ্বাদশ নিদান, (২৪) প্রত্যয়, (৪) সম্যক প্রধান, (৭) বোধঙ্গ, (৫) ইন্দ্রিয় এ ৬৪ প্রকার বুঝিয়েছে। তিনি

বলতেন একমাত্র প্রজ্ঞারূপে পদ্মের চৌষট্টি প্রকার পাঁপড়ীর রূপ, ৬৪ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম।

১৯৯০ সালে বর্তমান বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি **শ্রী রাখাল চন্দ্র বড়ুয়ার** অর্থানুকুল্যে এ মূল্যবান পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির বিক্রয় লব্দ অর্থ বিশ্বশান্তি প্যাগোডায় প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হিতকল্পে দান করেন। "সব্বদানং ধম্ম দানং জিনাতি" ভগবান বুদ্ধের এ অমর বানীর স্বার্থকতা পর্যবসিত হয়েছে, এ পুস্তক প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। সাথে সাথে পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের যে একজন উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্যিকদের মত জ্ঞান পরিমার অধিকারী ছিলেন তা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যাঙ্গণে এ পুস্তকটি এক মূল্যবান রত্ন হিসেবে সংযোজিত হল।

## ১৩। রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ঃ-

বাংলা সাহিত্য ভান্ডারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়। তাঁর অনেক গল্প কবিতা ও গীতিনাট্য বৌদ্ধ সংস্কৃতির আলোকে রচিত। আজ পর্যন্ত কয়েকজন গবেষক, রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে বলে প্রমাণ করেছেন। বর্তমান এ পুস্তকের লেখক জ্যোতিঃপাল মহাথের ও রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকায় তিনি "রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি" নামক মূল্যবান সমালোচনা পুস্তকটি পাঠক সমাজকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন ঘটনার প্রভাব রবীন্দ্র সাহিত্যে কিভাবে প্রবেশ করেছে, তিনি সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন। এ পুস্তক প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গিয়ে বলেছেন- "আমার বিদ্যাবুদ্ধি প্রাচীন পালি সংস্কৃত টোলের শিক্ষায় সীমিত। আধুনিক কালের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত অভিধ্যা আমার নেই। .....শাস্ত্রে আছে "আত্মানাং সর্বভূতেষু, সর্ব ভূতানং চাত্মনি" অর্থাৎ যিনি বিশ্বের সর্বজীবের মধ্যে নিজকে এবং নিজের মধ্যে বিশ্বের সর্ব জীবকে উপলব্দি করেন তিনি বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর অধিষ্ঠান সকলের অন্তরে। সবই তাঁর অন্তরতর। তিনি সাম্য-সৌম্য দৃষ্টি সম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব। মহাসমুদ্র দেখে কুপের বেঙ এর লম্ফ দেওয়ার ন্যায় আমি ছোটকালে নিজে নিজে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক পড়তে আরম্ভ করেছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁর গভীর ভাব-ভাষা কিছুই আমার বোধগম্য আসতনা। আজ সপ্তাশীতি (৮৭ বৎসর) বছর জরা বার্ধক্যে উপনীত হলেও

ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করে থাকি। জানিনা সে মহাসমুদ্রের গভীরতা কতটুকু বুঝেছি, কতটুকু উপলব্দি করেছি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে অনেক ক্ষেত্রে বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি নীতি আদর্শ যে নিহিত আছে তা একান্ত সত্য। তদ্ধেতু আমার এ ক্ষীণ প্রয়াস।"

রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি কত গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা থাকলে এরূপ একটি মূল্যবান সমালোচনা পুস্তক রচনা করা সম্ভব। এ গবেষণাধর্মী পুস্তকটি ২৭ অধ্যায়ে ৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রতি অধ্যায় তাত্ত্বিক সমালোচনায় সমৃদ্ধ। পালি সাহিত্যের প্রভাব কিভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রবেশ করেছে, উদাহরন স্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' একাঙ্কিটির কথা উল্লেখ করেছেন। এ একাঙ্কিটি পালিতে বর্ণিত 'কণব' জাতের অনুরূপ। একাঙ্কিটির প্রধান নায়ক বজ্রসেন একজন শঠ, চোর ও প্রবঞ্চক। অন্যদিকে একাঙ্কিটির নায়িকা শ্যামা একজন প্রেমিক, ভালবাসার এক জীবন্ত মূর্তিময়ী নারী। শেষ পর্যন্ত শ্যামা প্রবঞ্চক বজ্রসেনকে জীবন সঙ্গী রূপে লাভ করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নিয়েছিল। লেখক পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের প্রতিটি অধ্যায়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতি কিভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছিল, তা মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৯৭ সালে ৭৩ পৃষ্ঠায় পুস্তকটি **শ্রী সঞ্জয় কুমার বড়ুয়া** ও তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রচ্ছদে ভিক্ষাপাত্র হাতে দন্ডায়মান বুদ্ধের পার্শ্বে শ্বেত কেশশ্মশ্রু মন্ডিত বরীন্দ্রনাথের ছবিটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এ পুস্তক রচনার দ্বারা লেখকের সুযশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

## ১৪। বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা ঃ-

১৯৯৭ সালে পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর রচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের নয়াদিল্লির জগতজ্জ্যোতি বিহারে অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি "বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা" পুস্তকটি লিখেন। অপ্রত্যাশিত প্রবাস জীবনে বৌদ্ধ বচন লিখন-পঠনের দ্বারা জ্ঞান আহরণের প্রতি তাঁর যে কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পুস্তকে বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকা ও ভিক্ষু শ্রামণেরা যাতে ধর্মীয় জীবন যাপণ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি এ পুস্তকটি রচনা করেন। এ পুস্তকে বন্দনা বিধি, পূজা বিধি, শীল বিধি,

প্রব্রজ্যা বিধি, পরিত্রাণ বিধি, কর্মবাচ্য সহ আচার্যের প্রতি শিষ্যের, শিষ্যের প্রতি আচার্যের দৈনন্দিন কি করণীয় সে সব উল্লেখ রয়েছে।

এ পুস্তকের পান্ডুলিপি কুমিল্লা বৌদ্ধদের যুব সংগঠন 'বিমুক্তি সংসদের' সদস্যগণ ছাপাবেন বলে নিয়ে যান। দীর্ঘ বছর পর দুপচর গ্রামের কৃতি সন্তান **শ্রী তপন সিংহ**, এ পুস্তকের একটি ফটোকপি মহাথেরোর হাতে অর্পন করেন। মূল কপি কোথায় তা আজও পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন পর হলেও ফটোষ্ট্যাট কপি পেয়ে মহাথের অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারেই চট্টগ্রামের রাউজান গ্রামের স্বর্গীয় জ্ঞান রঞ্জন বড়ুয়ার সন্তানগণ পুস্তকটি প্রকাশ করে, সমাজের ও সদ্ধর্মের হিত সাধন করেন। গ্রন্থটির কলেবর ছোট হলেও দৈনন্দিন জীবনে এ পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা বৌদ্ধ সমাজ জীবনে অত্যধিক সুখপাঠ্য হয়েছে ঝক্‌ঝকে ছাপা পুস্তকটির বহুল প্রচার প্রয়োজন।

## ১৫। সাম্য সৌম্যই শক্তির উৎস ঃ-

শান্তি জীবের কাম্য। কিন্তু এ প্রপঞ্চময় বিশ্বে নিজে শান্তিতে বাস করা এবং অন্যকে শান্তি দেওয়া বড় কঠিন। তাই মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আপন চিত্তকে সংযত করাই সাধকের প্রধান কর্তব্য। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শন্তিপ্রিয় ও মৈত্রী পরায়ণ। মৈত্রী পরায়ণ ভিক্ষুর নিকট পর বলতে কেহ থাকেনা, সকলেই আপণ। এ পুস্তকের লেখক ও আপণ সাধনা বলে সকলকে আপণ করেছেন। সে ফলশ্রুতিতে তিনি এশীয় বৌদ্ধ শান্তি পদক লাভ করে নিজকে ধন্য করেছেন। তিনি শান্তির পূজারী ছিলেন বলেই, সারা জীবন জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মঙ্গল সাধন করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। লেখক ১৬ পৃষ্ঠার এ পুস্তি কাটিতে অশান্ত মানব সামাজে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে, সে কথাই তুলে ধরেছেন। পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের এ পুস্তিকাটিতে বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ কি, বুঝাতে গিয়ে বলেছেন- 'বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ উদ্দেশ্য নীতি হল সার্বজনীন, সার্বকামী, সার্বদেশিক। বিশ্বের সকল ভেদ-বৈষম্য নীতি বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী বিদ্রোহ। বিশেষত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, ম্লেচ্ছ, পুক্কুস, চামার, চন্ডাল, প্রভৃতি নীচ জাতি সমাজে অপাংক্তেয়, অস্পৃর্শ, লাঞ্ছিত, অপমানিত, অশুচি। তাদের সাথে উচ্চ বর্ণের আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। আহার-বিহার, সামাজিক অকর্তব্য। যে মহামানব সকল প্রকার ভেদ-বুদ্ধি, ভেদ-জজ্ঞানের উর্ধ্বে, সমগ্র মানব জাতিকে এক

অভিন্ন অখন্ড জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছেন। শুধু মানব কেন, সমগ্র প্রাণী জগতের প্রাণের প্রতি সমদর্শী সহমর্মী একাত্ম এবং যিনি কোনরূপ দাসত্বকে, মানবতার গ্লানিকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি হচ্ছেন করুণাঘন তথাগত বুদ্ধ। তিনিই বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বশান্তি, বিশ্বপ্রেম। পুস্তকটি ১৯৯৯ সনের ২৭শে জুলাই, কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন দুপচর গ্রামের স্বনামধন্য দায়ক **শ্রী রতন চন্দ্র সিংহ** ও তাঁর সহধর্মিনী **শ্রীমতি মুকুল রানী সিংহ** প্রকাশ করে সাম্য মৈত্রীর অমৃত সুধা বিতরণে ধন্য হয়েছেন।

## ১৬। বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতির ক্রমঃবিকাশ এবং পঞ্চবুদ্ধঃ-

এ পুস্তকের লেখক পূজনীয় শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের এক ঘটনা প্রভাহে পতিত হয়ে ইতিহাস তথ্য সমৃদ্ধ এ পুস্তকটি লিখেছেন। সর্বমোট সচিত্র ৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ পুস্তকটির প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেন কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন নুরপুর গ্রামের বিশিষ্ট দায়ক পরলোকগত হরিচরণ সিংহ ও তদীয় পত্নী সুজাতা সিংহের পুত্র জহর সিংহ ও শ্রী দুলাল সিংহ। এ পুস্তকটির সারগর্ভ ভূমিকা ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক **শ্রী তপন জ্যোতি বড়ুয়া**।

লেখকের প্রতিবেদন পাঠে জানা যায়,বান্দরবানে সমীপবতী রেইছা গ্রামে **শ্রী সাত কমল তঞ্চঙ্গ্যার** কন্যা **শ্রীমতী রেখা রানী তঞ্চঙ্গ্যা** স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বিহার প্রাঙ্গণের পূর্ব-পার্শ্বে নির্দিষ্ট জায়গায় সাতদিন বুদ্ধ পূজা করেন। পরে সে স্থানটি খনন করে ১'-৭'/প্রস্থ , এবং ৯'-৪'দৈর্ঘ্য পরিমিত একটি পাথরের মূর্তি পান। এ মুর্তির মাথার উপরে তারকা খচিত রয়েছে। রাতের অন্ধকারে তারকাগুলো হতে আলো বিচ্ছুরিত হয়।

পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের এ পুস্তকটির প্রারম্ভে ৬ষ্ঠ ধর্মসংগীতির বর্ণনা দিয়েছেন।পরে মহযান বৌদ্ধ দর্শন মতে আদি বুদ্ধ হতে যে পঞ্চবুদ্ধ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর ছবি সহ বর্ণনা দেন। পঞ্চবুদ্ধ হল ১) বৈরোচন, ২) রত্ন সম্ভব, ৩) অমিতাভ, ৪) অমোঘ সিদ্ধি, ৫) অক্ষোভ্য। এ পঞ্চবুদ্ধ যথাক্রমে রূপ,বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধের প্রতীক রূপে পরিচিত। পূজনীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের অতি সহজ সরল ভাষায় তাঁর অন্তিম সময়ের লেখা পুস্ত কটি সকলের নিকট সুখপাঠ্য হয়েছে।

এসব গ্রন্থ ব্যতীতও তিনি ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা, সাময়িকীতে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। বোধিপত্র ও বিশ্বশান্তি প্যাগোডা

নামে দুইটি সাময়িকী পত্রিকা আপন সম্পাদনায় প্রকাশ করে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মসভায় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদানে অবিদ্ধ্যাচ্ছন্ন মানুষের অন্তরে আলো প্রজ্জ্বলন করেছেন। তিনি এ নশ্বর জগতে আর নেই, কিন্তু তাঁর কীর্তি ও জ্ঞানগর্ভ লেখা যুগ যুগ ধরে মানুষকে প্রেরনা প্রদান করবে,যা সর্বৈব সত্য।

মহামান্য দশম সংঘরাজ আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। তাঁর নশ্বর দেহও বিগত ২০০২ সালের ১০ জানুয়ারী অগ্নির লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত। কিন্তু তিনি একজন আদর্শ বৌদ্ধ সাধক ও শিক্ষক, সত্যদ্রষ্ঠা ,সংগঠক ও শান্তির দূত হিসাবে বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। তাঁর আদর্শকে আপন চিন্তা-চেতনায় রূপদান করতে পারলেই ,প্রকৃত পক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। তাঁর আশীর্বাদেই আমাদের চলার পথের পাথেয় হউক এ কামনা করি।

○ বিতক্কপমথিতস্স জন্তুনো,
তিব্ বরাগস্স সুভানুপস্সিনো,
ভিয়্যো তণ্হা পবড্ঢতি
এস খো দল্হং করোতি বন্ধনং।

বিতর্কপীড়িত তীব্র রাগে অনুরক্ত এবং শুভদর্শী ব্যাক্তির তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। এই ব্যক্তি বন্ধনকেই দৃঢ় করে।

○ বিতক্কূপসমে চ যো রতো
অসুভং ভাবয়তি সদা সতো,
এসো খো ব্যন্তিকাহিতি
এসোছেজ্জতি মারবন্ধনং।

যিনি বিতর্কের উপশমে রত এবং সতত স্মৃতিমান হইয়া দেহাদির অশুভ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই মারবন্ধন নিঃশেষ করেন, তিনি উহা ছেদন করেন।

(বুদ্ধ)

# পরিশিষ্ট

## শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত/ সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর নামঃ-

| ক্রমিক নং- | প্রকাশিত গ্রন্থ | প্রকাশকাল ও প্রকাশক |
|---|---|---|
| ১। | ময়নামতির ইতিকথা | ১ম সংস্করণ-১৯৬৮ সাল<br>২য় সংস্করণ- ১৯৬৯ সাল<br>২৪১৩ বুদ্ধাব্দ-১৩৭৬ বঃ<br>প্রকাশকঃ সম্বোধি সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ,কুমিল্লা। |
| ২। | বাংলার সত্যসূর্য অতীশ দীপংকর | ১৯৭৯ খৃঃ ১৩৮৫ বঃ,কুমিল্লা। |
| ৩। | বিনয়াচার্য বংশদীপ | প্রকাশকঃ শ্রী প্রদীপ কুমার বড়ুয়া<br>গ্রামঃ বেলখাইন,ডাকঃ বুধপাড়া<br>পটিয়া-চট্রগ্রাম<br>১৯৮৯ খৃঃ-১৩৮৭ বঃ |
| ৪। | বৈশাখী পূর্ণিমা | প্রকাশকঃ বিমলজ্যোতি ভিক্ষু, জয়নগর,লাকসাম, কুমিল্লা।<br>১৯৮৩ খৃঃ ১৩৯০ বঃ |
| ৫। | বুদ্ধ ও মৌর্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম | ১৯৮৪ খৃঃ ১৩৯১ বঃ কুমিল্লা।<br>প্রকৌশলী অশোক বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। |
| ৬। | থিওসফিকেল সোসাইটির ইতিবৃত্ত | প্রকাশকঃ টি,এস, লজ কুমিল্লা, ১৯৮৫ খৃঃ |
| ৭। | জীবন সাধক পূর্ণানন্দ মহাথের | পকাশিকাঃ সতী রানী বড়ুয়া<br>মহামনি, পাহাড়তলী,চট্রগ্রাম। ১৩৯১ খৃঃ ১৩৯৮ বঃ |
| ৮। | পালি পাঠমালা (নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ সহায়িকা) | প্রকাশকঃ ধর্মরক্ষিত কল্যাণ ট্রাষ্ট, বেপারীপাড়া,রত্নাঙ্কুর বিহার, চন্দনাইস,চট্রগ্রাম।১৯৯০ সন। |
| ৯। | বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে রাসমোহন চক্রবর্তীর অবদান | প্রকাশকঃ শীলা প্রকাশনী, রাংগামাটি,পার্বত্য চট্রগ্রাম ১৯৯৪ সন |
| ১০। | কুমিল্লা জেলার ইতিকথা (যৌথ লেখক) | প্রকাশকঃ জেলা পরিষদ,কুমিল্লা ১৯৮৭ খৃঃ |
| ১১। | বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা, তৃতীয় শ্রেণী (যৌথ লেখক) | প্রকাশকঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড,ঢাকা।১৯৯৫ খৃঃ |

| | | |
|---|---|---|
| ১২। | বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা ৫ম শ্রেণী (যৌথ লেখক) | প্রকাশকঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড,ঢাকা।১৯৯৬ খৃঃ |
| ১৩। | The Singha Buddisht Community of Bangladesh (Book let) | ১ম সংস্করণঃ১৯৯৭ খৃঃ কুমিল্লা।২য় সংস্ককরণঃ১৯৯৯ মিঃ পরিমল বড়ুয়া (সিংহ),আমেরিকা। |
| ১৪। | Buddhisam in Comilla Bangladesh (Book let) | ১ম সংস্করণঃ১৯৯৭ খৃঃ কুমিল্লা। মিঃ তপন বড়ুয়া (সিংহ),আমেরিকা। ২য় সংস্ককরণঃ১৯৯৯ খৃঃ, কুমিল্লা। |
| ১৫। | পালি সিলেকসান (একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য) (যুগ্ম লেখক) | জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত, প্রকাশক, প্রগতি ট্রেডার্স,বাংলা বাজার,ঢাকা ১৯৯৯ খৃঃ |
| ১৬। | বৌদ্ধ ধর্মে মার দর্শন | প্রকাশক, শ্রী সুবিমল বড়ুয়া ও শ্রীমতী রত্না বড়ুয়া, চট্টগ্রাম ১৯৯৯ খৃঃ |
| ১৭। | জ্যোতিঃ পাল মহাথেরোর প্রবন্ধ সম্ভার | প্রকাশক- প্রকৌশলী শুভাশীষ বড়ুয়া ও শ্রী রতন সিংহ ২০০৪, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা। |
| ১৮। | Ancient Buddhist Heritage of comilla, Bangladesh. | published by Mr.Tapan Barua (Singha) New York,America,2004. |
| ১৮। | সাহিত্য সাধনায় মহামান্য -দশম সংঘরাজ | শ্রীমতী কানন বালা সিংহ। কোঁয়ার লামসাম,কুমিল্লা। ২০০৪ খ্রীঃ |
| ২০। | ময়নামতির ইতিকথা | ৩য় সংস্করন (প্রকাশিতব্য) প্রকাশনায় ঃ শ্রী প্রফুল্ল সিংহ, কুমিল্লা। |
| ২১। | মৃত্যুর পরপারে জীবন দর্শন | (প্রকাশিতব্য) প্রকাশনায় ঃ এডঃ পি কে বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। |
| ২২। | অতীশ দীপংকর (যাত্রাভিনয়) | প্রকাশিতব্য |
| ২৩। | কুমিল্লায় নৃ-তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ | প্রকাশিতব্য |
| ২৪। | স্বপ্নময়ী লালমাই (রোহিতগিরি) | প্রকাশিতব্য প্রকাশনায় ঃ শ্রীমতি মনিবালা সিংহ, চট্টগ্রাম। |
| ২৫। | ধর্মনিধি শীল ভদ্র | প্রকাশিতব্য |
| ২৬। | বাংলাদেশে সিংহ বৌদ্ধ সম্প্রদায় | প্রকাশিতব্য |
| ২৭। | বৌদ্ধ রঞ্জিকা যাধুখার | প্রকাশিতব্য |
| ২৮। | উপমহাদেশে বৌদ্ধ স্থাপত্য-শিল্প ও ভাস্কর্য | প্রকাশিতব্য |

# শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথের কর্তৃক প্রকাশনা ও সম্পাদনা

| ক্রমিক নং | প্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশকাল ও প্রকাশক |
|---|---|
| ১. কুমিল্লা বিহারের ইতিকথা লেখক- ডাঃ রবীন্দ্রনাথ বড়ুয়া | প্রকাশকঃ সম্বোধি সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ, কুমিল্লা। ১৯৬৭ খৃঃ |
| ২. অতীশ দীপঙ্কর লেখক- রাসমোহন চক্রবর্তী | প্রকাশকঃ সম্বোধি সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ, কুমিল্লা।১৯৬৭ খৃঃ |
| ৩. Contributions of Comilla to the Buddhist Culture in ancient times By-Rash Mohan Chakraborty. | 1st –Edition-1980<br>2nt-Edition-1982<br>3rd-Edition-1984<br>Publisher-Mr.P.K.Chakma Diginala.1984 |
| ৪. Lord Buddha and his message By-Rash Mohan Chakraborty. | Publisher-Sambodhi Society of Bangladesh, Comilla. |
| ৫. মাঘীপূর্ণিমা ও তথাগতের অন্তিম দেশনা লেখক-রাসমোহন চক্রবর্তী | ২৫১২ বুদ্ধাব্দ প্রথম সংস্করণ<br>২৫১২ বুদ্ধাব্দ প্রথম সংস্করণ প্রকাশকঃ সম্বোধি সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ। |
| ৬. রোহিতগিরি (সম্পাদক) কুমিল্লা বৌদ্ধ ভিক্ষু সমিতির মুখপত্র-১ম সংখ্যা | ১৯৯৫ খৃঃ<br>কনকস্তুপ বৌদ্ধ বিহার,কুমিল্লা। |